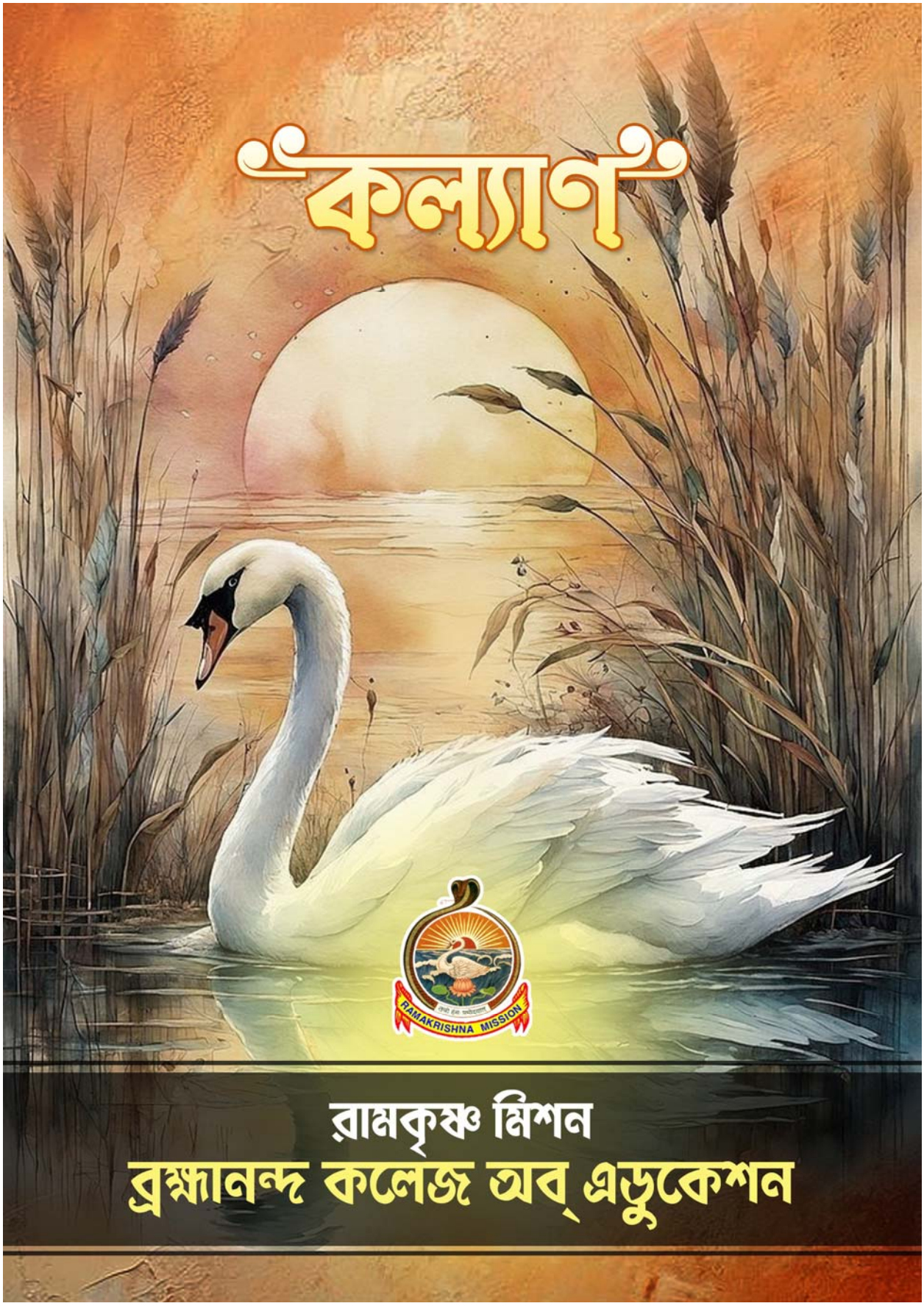

কল্যাণ
RAMAKRISHNA MISSION
রামকৃষ্ণ মিশন
ব্রহ্মানন্দ কলেজ অব্ এডুকেশন

কল্যাণ

রামকৃষ্ণ মিশন
ব্রহ্মানন্দ কলেজ অব্ এডুকেশন

রহড়া, কলকাতা - ৭০০ ১১৮

প্রকাশন সংখ্যা ঃ ৬১ **শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০২৪**

প্রধান উপদেষ্টা
অধ্যক্ষ, স্বামী নিরীশানন্দ

পত্রিকা সম্পাদক
অধ্যাপক, ড. কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

পত্রিকা উপসমিতির শিক্ষক সদস্য ঃ—
অধ্যাপক, ড. মলয়েন্দু দিন্দা
অধ্যাপক, ড. সঞ্জয় মিত্র

শিক্ষার্থী সদস্য ঃ—
শ্রী বৈজয়ন্ত মজুমদার
শ্রী সহিষ্ণু বিশ্বাস

প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ২০২৪
প্রকাশক ঃ স্বামী জয়ানন্দ
সচিব, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ স্বামী নিরীশানন্দ (অধ্যক্ষ)
মুদ্রণ ঃ রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
দূরভাষ ঃ ২৫৬৮-২৮৫০, ৩২১৯

কার্য নির্বাহক উপসমিতি ঃ ২০২৪

সভাপতি ঃ স্বামী নিরীশানন্দ, অধ্যক্ষ
শিক্ষক-সংসদ সম্পাদক ঃ ড. সুব্রত বিশ্বাস

—ঃ উপসমিতির আহ্বায়কবৃন্দ ঃ—

সাংস্কৃতিক কার্যাবলি ঃ ড. কৌশিক চট্টোপাধ্যায়
ভর্তি, পরীক্ষা, সময় নির্ঘণ্ট ও রেকর্ড ঃ ড. সঞ্জয় মিত্র,
শ্রী শুভজিৎ চক্রবর্তী

—ঃ ছাত্রাবাস সমিতি ঃ—

চেয়ারম্যান ঃ অধ্যক্ষ
সদস্য ঃ ছাত্রাবাস সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট,
হোস্টেল প্রিফেক্ট

RAMAKRISHNA MISSION BOYS' HOME
P.O. Rahara, Kolkata - 700 118 (West Bengal), INDIA
Phone : [STD – 033] 2568-2850 & 3219, Secy.–2523-6116 & 7666 [d]
[A Branch Centre of Ramakrishna Mission, Belur Math, Howrah-711202]

ডিসেম্বর, ২০২৪

শুভেচ্ছা

উজ্জ্বল ঐতিহ্যের ধারায় প্রকাশিত হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন ব্রহ্মানন্দ কলেজ অব্ এডুকেশনের মনন চর্চার বার্ষিক পত্রিকা কল্যাণ-এর ৬১তম সংখ্যা।

আজ মানুষ গড়ার শিক্ষা বড্ড প্রাসঙ্গিক, আদর্শ শিক্ষকই আশা-ভরসার স্থল এবং দৃঢ়তার প্রতীক। শিক্ষকদের সৃজনী ভাবনার প্রবাহ সমাজকে সার্থকতা দিতে পারে। 'কল্যাণ' তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। সার্থক হোক এর প্রকাশ। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা জানাই।

সম্পাদক

—ঃ সূচিপত্র ঃ—

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
পত্রিকা সম্পাদকের কলমে	ড. কৌশিক চট্টোপাধ্যায় (অধ্যাপক)	৬
ব্রজের রাখাল	কৌস্তভ ঘোষ	৭
মাতৃরূপেণ সংস্থিতা	সহিষ্ণু বিশ্বাস	১০
ভাগ্য	প্রসেনজিৎ প্রামাণিক	১১
বাংলার পটচিত্রের ইতিহাস ঃ সেকাল ও একাল	মলয় বাগ	১২
লক্ষ্য ভরা জীবন	কার্তিক দোলুই	১৮
বাংলার পালা কীর্তনের একাল ও সেকাল	সৌরভ মন্ডল	১৯
অপ্রয়োজনের শিক্ষা ঃ বিকাশের শিক্ষা	গৌর সূত্রধর	২১
আমি সেই নারী	শুভঙ্কর মাজি	২২
আমার গান আমার কথা	নীলাদ্রি চ্যাটার্জী	২৩
নিভে যাওয়া প্রদীপ	তাপস পাল	২৮
সংগীত ও প্রকৃতি	ড. মানস কুমার মৌলিক (অতিথি অধ্যাপক)	২৯
প্রতিবাদ	অঞ্জন সরকার	৩০
একটি বিকাল	তনুময় দাস	৩১
স্বাধীনতা	কুমারজিৎ কুণ্ডু	৩৪
গর্ভবতী মাকড়শা	অনুপ পাঁজা	৪২
এক শীতের সন্ধ্যায়	বিকাশ ধাড়া	৪৩
আধুনিক ভারত ও বক্সিং—একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা	বৈজয়ন্ত মজুমদার	৪৬
সেকালের বাংলার ফুটবলের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	অরিন্দম বিশ্বাস	৫২
মহাকাশ গবেষণায় ভারত	শুভঙ্কর সাহা	৫৬
সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি	শোভারাম মুর্মু	৬০
কী নিষ্ঠুর!	বিপল মণ্ডল	৬২

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
ছৌ-নাচ	প্রদ্যুৎ মাহাতো	৬৩
সুন্দরবনের মৎস্যজীবী	উজ্জ্বল দাস	৬৫
দর্শন অনুষঙ্গ	মনোরঞ্জন পাল	৬৬
ভারত ভাগ কি সত্যিই অনিবার্য ছিল?	কালোসোনা মণ্ডল	৬৮
কাজ ও অবসাদ	শুভ পরামানিক	৭২
শিক্ষামূলক ভ্রমণে 'ঘাটশিলা'	সুব্রত জেলে	৭৭
Swami Vivekananda's Notion of Womanhood	Swami Nirishananda (Principal [Actg.])	83
True Freedom	Shubhajit Mondal	92
A Poor Man and A Jinn	Meraj Hussain Ansari	94
A Letter to Man	Aditya Panda	95
The Era of Revolutionised Artificial Intelligence	Souvik Dalui	96
Echoes of Enlightenment : Exploring the Nexus of World Literature and Philosophical Wisdom	Soubhik Kundu	104
Fish Farming in Contai, West Bengal : A Thriving Industry	Suprakash Pal	119
Foundation History of ISRO	Soumen Maity	124
Sugar : The Silent and Invisible Killer	Subhadeep Porel	128
The Present Governing Body of the College		134
Our Faculties		135
List of B.Ed. Students for the Session : 2023-25		136

সম্পাদকীয়

হালকা শীত পড়েছে এখন। শীত এ দেশে বড়ো সুখের সময়। শীতের পৌষ মাস নিয়ে বাঙালির কত আবেগ। কত স্বপ্ন। কৃষিযুগ থেকে শিল্পযুগ পর্যন্ত শীতের কিংবা পৌষের কদর কমেনি কোনোদিন। বছরের সিংহভাগ সময় হাঁসফাঁস গরমে কাটিয়ে এ বড়ো শান্তির ঋতু এই গরমের দেশে। কিন্তু সেই সুখের শীত যদি প্রকৃতি ছেড়ে কঠিন শৈত্য হয়ে নেমে আসে প্রবহমান জীবনবোধে! শৈত্য যদি হয় আমাদের সমষ্টি সম্পর্কের পরিণাম! শৈত্য যদি হয় উত্তাপহীন স্পন্দনহীন নির্বিকার বেঁচে থাকার গল্প! তাহলে তাকে বরণ করি কি করে! শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের শিক্ষার্থীদের চোখে আজ আশংকার কালো মেঘ। সময়, অর্থ, শ্রম শেষে একটা সম্মানজনক চাকরির ইন্টারভিউ, একটা শিক্ষকতার পেশা জুটবে তো জীবনে! আশংকা থেকে শৈত্য তাদের পড়াশোনায়। আশংকা থেকে শৈত্য তাদের পঠন-পাঠন জীবনে। আশংকা থেকে শৈত্য তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে। শৈত্য তাদের সম্পর্কের নির্মাণে। বছরভর যে উচ্ছ্বাস আর আবেগ নিয়ে ট্রেনিং এর জীবন অতিবাহিত করেছে এতদিনের ছাত্রছাত্রীর দল। শৈত্য সেখানেও। দিন যায়, শৈত্য প্রবল হয়। জড়োসড়ো প্রজন্মের দিকে সব দোষ ঠেলে দিয়ে দায় এড়াতে চায় উদাসীন মানুষ। সমাজ কল্যাণের যে তিন মহামন্ত্র আছে, কল্যাণময় প্রাজন্মিক উত্তরাধিকারগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়মনিষ্ঠ সঞ্চালন এবং নতুনের আত্তীকরণ। সেই ত্রিবিধ উচ্চারণ নানান আছিলায় উপেক্ষিত হয়েছে যুগের পর যুগ। উদাসীন পূর্বপুরুষেরা সামন্ততান্ত্রিক যৌথ পরিবারগুলিকেও একদা অটুট ভেবেছিলেন। আটকানো যায়নি ভাঙন। সাহসী জীবনের বৈভব ভেঙে গেছে তাসের ঘরের মতন একদিন। বিবর্তনবাদের সূত্র মেনে ক্ষুদ্র জীবন একদিন বৃহৎ হবে; এই আলস্যময় বিশ্বাস যেন সর্বনাশ ডেকেছে জীবনে কোথাও। সভ্যতার গতি কি আজ ক্ষুদ্রতার দিকে? সভ্যতার গতি কি আজ নিষ্কলুষ আলস্যের দিকে? বিজ্ঞান প্রযুক্তির মুহূর্মুহু জয়ধ্বনি প্রতিষ্ঠা করে চলেছে কি আলস্যের আর ভোগের সেই চরম বাস্তবতা? সংশয় নেই, আধুনিক জীবনের স্নায়ুতন্ত্র আজ বিদ্যুৎ প্রবাহহীন অকেজো তারের কুণ্ডলী। আলো আর জ্বলে না সেখানে। স্নায়ুতন্ত্রে সাড়া জাগানোর ইচ্ছা নেতিয়ে গেছে কবেই। সংবদ্ধ জনতার আলোড়ন কদাচিৎ ওঠে আর নামে। কোন অপূর্ব জাদুমন্ত্রে থেমে যায় সমস্ত বায়বীয় প্রতিবাদ। স্তব্ধ হয়ে যায় হলদেটে খবরের কাগজের মুক্ত ঘোষণা। অসহায় চোখ যেন মৃত্যুর দিন গোনে। ভোগবাদের অনিবার্যতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মূল্যবোধের যে শিক্ষা ও পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের ভাবনাগুলি অপরিহার্য ছিল, তা লালিত-পালিত হয়নি কোনো দিন। এই মহাপাপের ফলভোগ তো আমাদের করতেই হবে। মুখোমুখী হতে হবে দুঃস্বপ্নময় জীবনের। এ তো এক মহামারীর গল্প। দার্শনিকের বিশ্বাস, তবুও অন্তঃসলিলার মতো বইবে জীবন। তবুও মানব থেকে যাবে। লুটেরা ও ধর্ষকের উল্লাস যতই বিষাক্ত করুক মনুষ্যত্বের শরীর, ধর্ষিতা মায়ের কান্নায় যতই বারবার ভেঙে পড়তে চাক দিগন্ত আকাশ; এ বড়ো বিস্ময়; তার মাঝেও জেগে থাকবে আশা। জেগে থাকবে স্বপ্ন। তার মাঝেও অস্ফুট কণ্ঠে গল্প বলা হবে নতুন করে বাঁচার।

আমাদের মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকার পাতায় পাতায় ধরা পড়ে সেই প্রাজন্মিক প্রতিশ্রুতি। কণ্ঠ দুর্বল। লেখনীতে আড়ষ্টতা আছে। মানোত্তীর্ণ হয়তো নয় কোনো লেখাই, তবুও জীবনের গন্ধ আছে খাদ কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রজন্মের; এ বড়ো কম কথা নয়। আপনাদের আশীর্বাদই আমাদের সন্তানতুল্য ছাত্রগুলির সব থেকে বড়ো ভরসা। বড়ো অবলম্বন। শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আশীর্বাদে এ কঠিন সময়ে ভালো থাকুন সবাই।

ড. কৌশিক চট্টোপাধ্যায়
পত্রিকা সম্পাদক

ব্রজের রাখাল

কৌস্তভ ঘোষ (ছাত্র, বি.এড. দ্বিতীয় বর্ষ)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "বিষয়ী সংসারী লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে জিভ জ্বলে গেল।" একদিন তিনি ব্যাকুল চিত্তে মহামায়ার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, ভবতারিণী তথা জগন্মাতা সে কথা নিশ্চয়ই শুনেছিলেন। তাই আমরা দেখি সংসারী ভক্তদের পাশাপাশি একঝাঁক তরুণ যুবক ভিড় জমাচ্ছেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঐশ্বরিক আড্ডায়। সেই একঝাঁক যুবকের মধ্যে ছিলেন ঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল যিনি যথাসময় উত্তীর্ণ হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ রূপে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় যে কী ছিলেন, কোন ভাবের পথিক ছিলেন, তা এক কথায় বলা সম্ভব নয়। এ যুগের অবতার ঠাকুর লীলা করবার জন্য যেসব চিহ্নিত ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে এলেন, এরা কেউ আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নন। ঠাকুরের অনন্ত ভাব শিষ্যদের মধ্যে বিভিন্নভাবে রূপ পেয়েছে। মহারাজ ছিলেন কৃষ্ণসখা ব্রজের রাখাল।

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাখাল (পরবর্তীকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ছিলেন ধনীর আদরের দুলাল। ১৮৮১ খ্রীঃ স্বামী বিবেকানন্দের দক্ষিণেশ্বর আসার চার/পাঁচ মাস পূর্বে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসেন অল্প বয়সে। তিনি রাখালচন্দ্রকে তার সন্তান বলেই ভাবতেন। ভাবাবেশে, আবেগ ভরে পুত্রের ন্যায় কত স্নেহ করতেন। লীলাপ্রসঙ্গে তার কিছু কিছু আভাস দেওয়া আছে। ঠাকুর বলতেন ঃ "রাখাল আসিবার কয়েকদিন পূর্বে দেখিতেছি মা একটি বালককে আনিয়া সহসা আমার কোলে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, 'এটি তোমার পুত্র'। শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম-সে কি? আমার আবার ছেলে কি? তিনি তাহাতে হাসিয়া বুঝাইয়াছিলেন-সাধারণ সংসারী ভাবে ছেলে নয়-ত্যাগী মানস-পুত্র, তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরে রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বুঝিলাম এই সেই বালক।"

রামকৃষ্ণাবতারলীলায় এই 'পিতাপুত্রে'র মিলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কোন্নগর থেকে গঙ্গা পার হয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসেছেন ভক্ত মনোমোহন মিত্র, সঙ্গে এনেছেন তাঁর নিকট-আত্মীয় এক যুবককে। তাঁরা দুইজনেই ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করলেন। যুবকের উপর দৃষ্টি পড়তেই পরমপুরুষের হৃদয় সাগরে যেন নব জোয়ার এলো। দেখেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই ব্রজের কৃষ্ণসখা। সহজেই সনাক্ত করেন তাঁর পূর্বদ্রষ্ট জগন্মাতা-প্রতিশ্রুত মানসপুত্রকে। কিন্তু ভাবনিধি শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহারে কোন আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল না সেই সময়। তিনি স্মিতহাস্যে মনোমোহনকে বলেন, "এ সুন্দর আধার।" যুবকের নাম 'রাখালচন্দ্র' শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আবার যেন ভাবাবিষ্ট হলেন, অস্ফুটস্বরে একবার মাত্র বললেন, "সেই নাম। রাখাল-ব্রজের রাখাল।"

শ্রীভগবানের বাৎসল্য লীলা যে কেমন হতে পারে তা প্রমাণিত হয়েছে যশোদারূপী শ্রীরামকৃষ্ণের রাখাললীলা দেখে। ঠাকুর বলছেন ঃ "তখন রাখালের এমন ভাব ছিল — ঠিক যেন তিন চারি বৎসরের

ছেলে। আমাকে ঠিক মাতার ন্যায়, থাকিতে থাকিতে সহসা দৌড়িয়া আসিয়া ক্রোড়ে বসিয়া পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তন পান করিত।"

আবার, দক্ষিণেশ্বরে রাখালের সঙ্গে যে লীলা প্রকট হয়েছিল তা একান্তই বৃন্দাবনের। ঐ চিন্ময় বালক রাখালকে ঘিরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর অপূর্ব চিন্ময় বালকত্বের প্রকাশ ঘটত। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে রাখালের আসা এযুগের এক কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণসখার মিলন।

এক যুবকের পক্ষে শিশু হয়ে যাওয়া এবং এক প্রৌঢ়ের পক্ষে মাতৃবৎ এবং শিশুবৎ হয়ে যাওয়া দুটিই আমাদের কাছে বিস্ময়। বৃন্দাবনলীলাও যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। এ ঠাকুর জানতেন, তাঁর মানসপুত্র সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল। তিনি 'গোপাল' 'গোপাল' বলে স্বহস্তে তাঁকে খাওয়াতেন, আর কত ভাবেই না আদর করতেন। রাখাল বারে বার ছুটে আসতেন ঠাকুরের পদস্পর্শ পাবার জন্য। রাখালের বাবা মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বর এসে রাখালকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেও কোন লাভ হয়নি। দক্ষিণেশ্বরেই মনপ্রাণ নিবেদন করল রাখাল, জারিত হতে লাগল ঠাকুরের ভাবধারায়।

মাঝে মাঝে কুটকাচালি বা মনোমালিন্য হলে ঠাকুরই ঘুরিয়ে দিতেন মোড়। অন্যায় দেখলে ঠাকুর শাসন করতেন। একদিন কালীমন্দির থেকে প্রসাদী মাখন এসেছে, রাখাল ক্ষুধার্ত ছিলেন, তাই অনুমতির অপেক্ষা না করেই মাখনের ডেলাটি তুলে মুখে দিলেন। ঠাকুর অমনি বিরক্ত হয়ে বললেন, "তুই তো ভারী লোভী! এখানে এসে কোথায় লোভ ত্যাগে যত্ন করবি, তা না করে আপনি নিয়ে খেলি?" লজ্জায় রাখালের মুখ আরক্তিম হল।

একদিন দুপুরের খাওয়ার পরে ঠাকুর বললেন, "ওরে রাখাল, পান সাজ না, পান নেই যে!" মানসপুত্র উত্তর দিলেন, "পান সাজতে জানি নে।" "সে কি রে? পান সাজবি, তার আবার জানাজানি কি, যা পান সেজে আন।" "পারব না, মশায়" — জবাব শুনে ঠাকুর হেসেই আকুল। এইরূপ সপ্রতিভ ব্যবহারে ঠাকুর বুঝেছিলেন রাখাল সত্যিসত্যিই তাঁকে একান্ত আপনার জন বলে গ্রহণ করেছে — তাঁর আচরণে কোনও কৃত্রিমতা নেই, আছে শুধু স্নেহসম্ভূত আবদার। রাখালের অবাধ্যতায় বিরক্ত না হয়ে বরঞ্চ আনন্দ করতেন। কিন্তু এইরূপ স্থান বিশেষে তাঁর ব্যবহার ঠাকুরের কৌতুক জাগালেও রাখাল সত্যিই তাঁর শাসনের অতীত ছিল এমন নয়।

অন্য একদিন একটি পয়সা দেখে রাখাল কুড়িয়ে আনলেন — ইচ্ছা, কোন ভিখারি বা অন্ধ-খঞ্জকে দেবেন। তিনি ঠাকুরকে সরলভাবে সব কথাই জানাতেন; সুতরাং এই ঘটনার কথাও নিবেদন করলেন। ঠাকুর শুনেই তাঁকে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, "যে মাছ খায় না, সে মাছের বাজারেই বা যাবে কেন? তোর যখন নিজের কোন দরকার নেই, তখন তুই কেন ঐ পয়সা ছুঁতে গেলি?"

ঠাকুর নিজে বিশেষ বিশেষ স্থানে শাসন বা সাবধান করে দিলেও, অন্য কেউ রাখালকে কোন রূঢ় কথা বললে একদম সহ্য করতেন না, মানসপুত্রকে অন্য কেউ শাসন করলে স্নেহবিগলিতকণ্ঠে বলতেন, "রাখালের দোষ ধরতে নেই, ওর গাল টিপলে দুধ বেরোয়।" আবার কেউ কোন কাজের আদেশ করলে বলতেন, "আহা! ও দুধের ছেলে, ওকে তোরা কোন কাজ করতে বলিস নি। ওর বড় কোমল স্বভাব।"

একদিন রাখাল বিকালে দক্ষিণেশ্বরে এসে দেখেন, ঠাকুর তাঁর ছোট মেঝেতে খাটটিতে বিশ্রাম করছেন। তাঁকে দেখে ঠাকুর একটু পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বললেন। রাখাল প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ঠাকুর জোর করে বললেন, "হাত বুলিয়ে দে না দেখবি সাধু সেবার ফল পাবি।" অনিচ্ছার মনোভাব নিয়ে পায়ে হাত বোলাতে বোলাতে কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন। মা-কালী একটি সাত/আট বছরের মেয়ের বয়সি হয়ে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে ঠাকুরের খাটের চারিপাশে কয়েকবার ঘুরলেন। তাঁর পায়ে মল বাজছে ঝুনুঝুনু করে। শেষে ঠাকুরের বুকেই তিনি মিলিয়ে গেলেন। চোখ বন্ধ করে শোয়া অবস্থায় ঠাকুর অল্প হেসে বললেন, "সাধু সেবার ফল হাতে হাতেই পেলি।" শ্রীরামকৃষ্ণ চরণসেবার সঙ্গে সঙ্গে রাখালের মা কালীর দর্শন হয়ে গেল।

ঠাকুর একদিন বলেছিলেন — রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছা করলে সে একটা রাজ্য চালাতে পারে। সবাই তাঁকে রাজা মহারাজ বলেই ডাকতেন। রামকৃষ্ণ মঠ ট্রাস্ট হিসাবে নথিভুক্ত হবার পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ হলেন তার প্রেসিডেন্ট। তাঁর সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ ভাবধারার ব্যাপক প্রসার ঘটে। নামটি সার্থক হয়েছিল বটে। তাই মহারাজকে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত করে স্বামীজী ওঁকে অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের এই প্রতিমাকে প্রণাম করে বলেছিলেন ঃ "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু"।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদদের মধ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীরূপ বিহঙ্গটিই শ্রীরামকৃষ্ণ রূপ মাস্তুলে এসে প্রথম বসেছিলেন। ঠাকুর রামলালদাদাকে বলতেন ঃ ও রামনেলো! রাখাল-লেটোর যুদ্ধ দেখবি আয় রে!" ঠাকুর ব্যঙ্গচ্ছলে রামলাল দাদাকে জিজ্ঞাসা করলেন — "বল তো, কে বেশী ভক্ত, রাখাল না লেটো?" রামলাল বললেন — "মনে হয় রাখালই বেশি ভক্ত।" ঠাকুর সহাস্যে তা সমর্থন করেছিলেন। শ্রীমায়ের ভাষায় ঃ মহারাজ ছিলেন "ফজলি আম"। রাজা মহারাজ ছিলেন ভাবজগতের উৎস। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অন্যতম চরিতকার স্বামী প্রভানন্দজীর ভাষায় ঃ "রসসৃষ্টিই তাঁহার অন্তরাত্মার সহজ প্রকাশ। আনন্দ বিতরণই তাঁহার গভীর উপলব্ধির অনিবার্য বিকাশ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভগবানের অবতার। "পূর্ব পূর্ব অবতার এলো কলাংশে যাঁহার। স্বয়ং সে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে এবার।" রাখাল ছিলেন তাঁর গোচারণের সঙ্গী। ইদানীং সেই রাখাল সমগ্র পৃথিবীর আধ্যাত্মিক জাগরণের পরিচালনা করিয়েছেন দীর্ঘ কাল ধরে। তাই মর্ত্যলীলার অন্তিম অধ্যায়ে রাজা মহারাজ বলছেন, "এই যে পূর্ণচন্দ্র! রামকৃষ্ণ! রামকৃষ্ণে কৃষ্ণটি আমি ব্রজের রাখাল, দে দে, আমায় ঘুঙুর পরিয়ে দে। আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচব। ঝুম ঝুম, ঝুম ঝুম। কৃষ্ণ এসেছেন, কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কি সুন্দর আমার কৃষ্ণ-কমলে কৃষ্ণ, ব্রজের কৃষ্ণ!"

গ্রন্থসূত্র ঃ—

১। স্বামী প্রভানন্দ, ব্রহ্মানন্দ চরিত, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২।

২। ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা।

৩। ভজনানন্দে ব্রজের রাখাল স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

সহিষ্ণু বিশ্বাস (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

যুগ যুগ ধরে মানবের সমাজে মহিলারা কখনো কন্যা, কখনো বোন, কখনো স্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ভারতীয় নারীদের আমরা দেবী দুর্গার রূপে কল্পনা করি। কারণ দেবী দুর্গার দশ হাতের মত তারাও প্রতিটি সম্পর্কের সমস্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছেন। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা বহু শত শত বছর নিজেদের ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তবে সময় বদলেছে, মহিলারা বর্তমানে শুধু ঘরেই নিজেদের আবদ্ধ করে রাখেননি; খাঁচা ভেঙে তারাও স্বপ্নের আলোকে ডানা মেলেছেন।

কুমোরটুলি এই নামটির সাথে কলকাতার সংস্কৃতি, ইতিহাস ও শিল্প সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কুমোরটুলি হল সেই স্থান যা ছাড়া দুর্গা পূজা ভাবা যায় না, যেখানে মা চিন্ময়ী মৃন্ময়ী রূপে অবতীর্ণ হন। একটা সময় ছিল যখন কুমোরটুলিতে মৃৎশিল্পালয় গুলিতে ঘরের মহিলাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মনে করত; মৃৎশিল্প মহিলাদের কর্ম নয়। তবে বর্তমানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কুমোরটুলিতে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা মৃৎশিল্পীরাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে চলেছেন। তাদের সবার মধ্যে কেউ এসেছেন মনের ইচ্ছায় বা শিল্পের টানে অথবা কেউ এসেছেন অভাবের তাড়নায় বা সংসারের হাল ধরতে। চায়না পাল, কাকলি পাল, মালা পাল এনারা সবাই কুমোরটুলির প্রসিদ্ধ মহিলা শিল্পী, এনাদের অনেকেরই তৈরি প্রতিমা কলকাতা পেরিয়ে আজ ভিন রাজ্যে বা বিদেশেও পাড়ি দিয়েছে। তবে একটা সময় প্রতি মুহূর্তে তাদের লড়াই করতে হয়েছে পুরুষশাসিত এই সমাজের সাথে, তাদের কাজ করতে না দেবার প্রচেষ্টা বহুবার হয়েছে। তবে কোন কিছুই তাদের আটকাতে পারেনি, এখন তারা সুপ্রতিষ্ঠিত, বহু বড় বড় পুজো উদ্যোক্তারা তাদের প্রতিমার অর্ডার দেন। তাদের এই লড়াই এর কথা এখন বহু প্রচলিত সর্বত্র।

চায়না পাল যখন তার বাবা হেমন্ত পালের প্রতিমা স্টুডিওর দায়িত্ব নেন তা আজ থেকে প্রায় ২৫ বছর আগের কথা। দুর্গাপূজার ঠিক একমাস আগে হেমন্ত পালের মৃত্যু হয়, শুরু হয় বেঁচে থাকার সংগ্রাম। প্রায় ৬০ ছুঁইছুঁই চায়না পাল তখন পুরুষ শিল্পীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। শুধু তাই নয় তার বাবার স্টুডিওর পুরুষ কারিগররাও একজন মহিলার অধীনে কাজ করতে রাজি হননি। সংকীর্ণ ফুটপাতে প্রতিমা রাখলে অন্য শিল্পীরা ঝামেলা করতেন, তাঁর চোখে জল এসে যেত কিন্তু তিনি মুখ বন্ধ করে কাজ করে যেতেন। সবসময় সাহায্যের বদলে পেয়েছেন অবহেলা ও তাচ্ছিল্য; কিন্তু তাই তাদের শক্তি যুগিয়েছে এগিয়ে চলার। বাবা কোনদিনই চাননি মেয়ে স্টুডিওতে এসে কাজ করুক। কিন্তু অদম্য ইচ্ছা ও মৃৎশিল্পের প্রতি ভালবাসার টান তাকে কুরে

কুরে খেতে লাগতো। সুযোগ এলো, বাবার মৃত্যুর পর দাদার হাত ধরে মৃৎ শিল্পালয়ে প্রথম পা রাখলেন মালা পাল। যখন তার বয়স মাত্র ১৪ তখন থেকে তিনি কাজ শেখেন তাঁর দাদার কাছে, আজ তার প্রতিমা জার্মানি, লন্ডন-এ যাচ্ছে, ছোট ছোট বাচ্চাদের ওয়ার্কশপ-এর মাধ্যমে প্রতিমা তৈরির কাজ শেখাচ্ছেন তিনি। তিনি চান নতুন প্রজন্মও যেন এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখে।

দুর্গাপুজোর ঠিক পরেই হঠাৎই স্বামীর মৃত্যুর পর বায়না করা প্রতিমার অর্ডার ও সংসারের হাল ধরতে মৃৎশিল্পালয়ের অন্দরে আসতে হয় কাকলি পালকে। শুরুটা ভয়ানক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গেছে, একজন বিধবা অসহায় মহিলার পাশে তখন কেউ এসে দাঁড়ায়নি। তবে আজ তিনি সাবলম্বী। এখন তার স্বামীর তুলনায় তিনি চারগুণ বেশি প্রতিমা তৈরি করেন।

আজ অনেক স্বপ্ন বাস্তবে ডানা মেলেছে কুমোরটুলিতে। আজ কুমোরটুলির প্রতিটা ঘরের প্রতিটা মেয়ের অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, কুমোরটুলিরই মহিলা মৃৎ শিল্পীরা। গর্ব ও মর্যাদার সাথে মাথা উঁচু করে তারা কাজ করছেন। আর আমরা তথাকথিত পুরুষ সমাজ আজ শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের নত মস্তক হয়ে সম্মান জানাচ্ছি। মা তুমি আমাদের ক্ষমা করো। সেই সরু গলিটায় হঠাৎই অনেক লোক, ঢাকে কাঠি পড়ল, মায়ের ঘর ছেড়ে উমা চললেন আর এক ঘরে। দূরে কোথাও মাইক-এ বেজে উঠল —

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

ভাগ্য

প্রসেনজিৎ প্রামাণিক (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

গরীবের ঘরে জন্মানো
ওরা বলে ভাগ্যের দোষ।
মেনে নাও যা বলি করে যাও,
এটাই তো ভাগ্যের আড়ালে,
শয়তান জোঁক শোষে রক্ত;
প্রতিরোধ না গড়লে
বেঁচে থাকা হবে শক্ত।।
বেইমান ভরে আছে দেশটায়,
আর ভয় নয় ধর হাতিয়ার;
সংহত শক্তির চেষ্টায়
কেড়ে নাও বাঁচবার অধিকার।।

বাংলার পটচিত্রের ইতিহাস ঃ সেকাল ও একাল

মলয় বাগ (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

পট শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত "পট্ট" থেকে। যার অর্থ কাপড়। প্রাচীন লোকশিল্পের একটি অতি প্রচলিত আঙ্গিক হলো পট। প্রাচীন বাংলা এবং বাংলার আশপাশের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের বিরাট অংশের ঐতিহ্যের বাহক এই পট। পটচিত্র মূলত বাংলা এবং ওড়িশা অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী শিল্প। রাজস্থানের কিছু অঞ্চলেও পটচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তবে তা বাংলা বা ওড়িশার মত সমৃদ্ধশালী নয়।

ইতিহাসের পাতায় বাংলার পটচিত্র ঃ—

খ্রীষ্টজন্ম পরবর্তী প্রথম শতকে বৌদ্ধভিক্ষুরা বুদ্ধদেবের জীবনী ও পূর্বজন্ম সংক্রান্ত জাতকের গল্প নিয়ে তৈরি করা একপ্রকার বিশেষ পট প্রদর্শন করতেন যাকে বলা হয় মঙ্করী পট।

দ্বিতীয় শতকে রচিত হরিবংশ গ্রন্থে, চতুর্থ শতকে কালিদাস রচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলম ও মালবিকাগ্নিমিত্রম গ্রন্থে, সপ্তম শতকে বানভট্ট রচিত হর্ষচরিত এবং অষ্টম-নবম শতকে রচিত উত্তররামচরিত গ্রন্থে পটচিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। অষ্টম শতকে রচিত বলে অনুমিত বিশাখ দত্তের বিখ্যাত নাটক মুদ্রারাক্ষস-এও যমপটের উল্লেখ আছে।

ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারের জন্য নবদ্বীপে পটের ব্যবহার হতো। এই ষোড়শ শতকের বিখ্যাত কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন, 'পট পড়িয়া বলে কেহ নগরে নগরে।'

পৌরাণিক কথা ঃ—

প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী পটুয়ারা হলেন বিশ্বকর্মার বংশধর। দেবাদিদেব মহাদেবের বিনা অনুমতিতে তাঁর ছবি আঁকার পর পটুয়াদের আদিপুরুষ তা গোপন করার জন্য তুলি মুখে পুরে তা গোপনের চেষ্টা করলে মহাদেব তা দেখে ফেলেন। তুলি এঁটো করার দায়ে মহাদেবের অভিশাপে এরা জাতে পতিত হয় এবং 'মুসলমানের রীতি' ও 'হিন্দুর ধর্ম' করতে আদিষ্ট হয়। সেই থেকে চিত্রকর পটুয়ারা মুসলমানদের মতো নামাজ করে ও হিন্দুর মতো দেবদেবীর ছবি আঁকে ও তাঁদের মহিমা কীর্তন গান করে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের দশম অধ্যায়েও পটুয়া বা চিত্রকর জাতির উদ্ভব নিয়ে অনুরূপ একটি কাহিনী পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বকর্মার ঔরসে গোপকন্যাবেশী অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে নয়টি পুত্রের জন্ম হয়। এই নয়পুত্র হলেন মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, কুন্দিবক (তন্তুবায়), কুম্ভকার, কাংশ্যকার, সূত্রধর, চিত্রকার ও স্বর্ণকার। এই নয়পুত্রের মধ্যে চিত্রকার বা চিত্রকর হলেন পটুয়াদের আদিপুরুষ। ব্রাহ্মণ নির্দিষ্ট চিত্রপদ্ধতি অনুসরণ করে

স্বতন্ত্র চিত্ররীতি অবলম্বন করায় ব্রহ্মশাপে তারা জাতিতে পতিত হয়। সেই থেকে তারা না হিন্দু না মুসলমান হয়ে তারা এক প্রান্তিক জীবন-যাপন করে। এরা নামাজ পড়লেও এদের নাম হিন্দুদের মতোই। পটুয়াদের সঙ্গে মুসলমান রীতিনীতির অনেক মিল থাকলেও এদের মধ্যে হিন্দু আচার অনুসারীরও অভাব নেই। কালিঘাটের পটুয়ারা ছিলেন বৃত্তিত্যাগী, তাদের বেশিরভাগই ছিলেন সূত্রধর সম্প্রদায়ভুক্ত।

পটুয়া সম্প্রদায় ও পটের গান ঃ—

এই সম্প্রদায়ের মানুষই মূলত পট অঙ্কন করে ও এই পট প্রদর্শনের মাধ্যমে গান গেয়ে পটের কাহিনী বর্ণনা করে। বাংলায় মূলত বেদে সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই পটের গান করতো। বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে বাংলার মানুষের কাছে বিনোদনের অন্যতম উপাদান ছিলো পটের গান। পটুয়া সঙ্গীতের প্রচলন পূর্বে সম্পূর্ণ রাঢ় অঞ্চলে থাকলেও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, মেদিনীপুরের পিঙ্গলা ব্লকের নয়াগ্রাম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ জেলায় এই গীত শোনা যায়। পিঙ্গলা ব্লকের নয়াগ্রাম এই প্রাচীন ঐতিহ্যকে এখনও দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। এখানকার প্রায় পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নটি পরিবার পটশিল্প ও পটুয়া সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত আছে।

পটের গান মূলত তিন প্রকার ঃ যথা — লীলাকাহিনী, পঞ্চ কল্যাণী ও গোপালন বিষয়ক গীতিকা। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য পট গীতিকার হলেন দুখুশ্যাম, রাণী চিত্রকর, গৌরী চিত্রকর, পুলিন চিত্রকর।

বাংলাদেশের পটুয়াখালি, কুমিল্লা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ জেলায় এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া জেলায় পটুয়াদের বাস ছিল। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার পটুয়াটোলা আর বাংলাদেশের পটুয়াখালির নামকরণ 'পটুয়া' থেকে হয়েছে বলে কেউ কেউ ধারণা করেন। এ থেকেই অনুমান করা যায়, এককালে পটুয়াদের বিচরণক্ষেত্র ও পটশিল্পের প্রভাব কতটা বিস্তৃত ছিল।

অঙ্কন পদ্ধতি ঃ—

- পটুয়ারা তাদের পরম্পরাগত জ্ঞান থেকে প্রকৃতি থেকেই নানা রঙ আহরণ করে।
- হলুদ রঙ সংগৃহীত হয় হলুদ বা আলামাটি থেকে বা হলুদ গাছের শিকড় থেকে।
- সবুজ রঙ সংগৃহীত হয় শিমপাতা বা হিঞ্চে শাকের রস থেকে। বেলপাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করেও তৈরি হয় সবুজ রঙ।
- বেগুনি রঙ তৈরি হয় জাম বা পাকা পুঁই মুচুড়ি থেকে।
- নীল রঙ তৈরি হয় অপরাজিতা ফুল বা তুঁত থেকে।
- খড়িমাটির সঙ্গে সামান্য নীল মিশিয়ে তৈরি হয় সাদা রঙ।
- লালচে রঙ তৈরি হয় পোড়ামাটি বা লাল গিরিমাটি থেকে। পাকা তেলাকুচা থেকে পাওয়া যায় লাল রঙ। সজনে গাছের পাতা বেটে লাল রং তৈরি করা যায়।

➽ কালো রঙের জন্য পোড়ামাটির গা থেকে ছেঁচে নেওয়া হয় ভুষোকালি। গাব গাছের শিকড় পুড়িয়েও তৈরি হয় কালো রঙ।

➽ জেলা ভেদে অবশ্য এই রঙের উৎসও আলাদা হতে দেখা যায়। রঙ গোলা হয় মাটির খুরি বা নারকেলের মালায়।

➽ পটুয়াদের তুলি তৈরি হয় বাচ্চা ছাগলের ঘাড়ের লোম বা পেটের লোম থেকে। সরু তুলির জন্য অবশ্য ব্যবহৃত হয় কাঠবেড়ালির লোম বা বেজির লেজের চুল। অধুনা অবশ্য পটুয়ারা বাজার থেকে কেনা রঙ তুলির উপরই বেশি নির্ভর করছেন।

➽ কোন রঙের সঙ্গে কোন রঙ মেশালে কোন রঙ পাওয়া যায় বা কিভাবে রঙের ঔজ্জ্বল্য এবং স্থায়িত্ব বাড়ে সে বিষয়ে পটুয়ারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ। রঙ ভালোভাবে ধরানোর জন্য রঙের সঙ্গে মেশানো হয় বেল, গঁদ, শিরিষ বা নিমের আঠা। নিমের আঠা পটকে পোকামাকড়ের হাত থেকেও বাঁচায়। অনেক সময় তেঁতুলবিচি ভিজিয়ে সেদ্ধ করে তৈরি করা থকথকে কাই বা ডিমের কুসুমও রঙ ধরানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

➽ সাধারণত বড়ো সুতির কাপড়ের ওপর গোবর আঠা মাটি প্রভৃতি মিশিয়ে ভালো করে প্রলেপ দেওয়া হয়। তারপর সেটা রোদে ভালো করে শুকিয়ে তার ওপর আঁকা হয়।

পটের প্রকার ভেদ ঃ—

পট মূলত দুই প্রকার; চৌকশ পট ও জড়ানো পট।

চৌকশ পট ঃ এগুলো আকারে ছোট। একটি ফুলস্কেপ কাগজের চেয়ে সামান্য বড় হত। এতে একটি মাত্র ছবি আঁকা থাকত। যেমন — কালীঘাটের পট।

জড়ানো পট ঃ এই চিত্রের কাপড় আট থেকে পঁচিশ হাত লম্বা এবং দু' থেকে আড়াই হাত চওড়া হয়ে থাকে। একটি কাঠের দণ্ডে পট পেঁচিয়ে বা জড়িয়ে রাখা হত বলে এ-ধরনের পটকে 'জড়ানো পট' বলা হত। এতে ধারাবাহিকভাবে ছবি আঁকা থাকত। পটুয়ারা জড়ানো পট খুলে গানের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে ছবির বর্ণনা করতেন। মেদিনীপুরের জড়ানো পট বিখ্যাত।

বিভিন্ন পট ঃ—

ক) চালচিত্র ঃ— চালচিত্র হল সাবেকি দুর্গা প্রতিমার উপরিভাগে অঙ্কিত দেবদেবীর কাহিনিমূলক পটচিত্র, যা প্রধানত অর্ধগোলাকৃতি হয়। এটি দুর্গাচালা বা দেবীচাল নামেও পরিচিত। এই চিত্রকলার একটি নিজস্ব রূপরেখা ও শৈলীগত দৃঢ় বুনিয়াদ রয়েছে। শিল্পীদের ভাষায় এই চালচিত্র হল 'পট লেখা', যা বাংলার পটচিত্রের একটি বিশেষ ধারা। চালচিত্রের মূল বিষয়বস্তু হল শিবদুর্গা, কৈলাস, শিব অনুচর নন্দীভৃঙ্গী, মহিষাসুর বধ, দশাবতার ইত্যাদি। বীরভূম জেলার হাটসেরান্দির সূত্রধর সমাজে এই ধরনের এক বিশেষ চিত্রসম্ভার দেখা যায়, যাকে দুর্গা পট বলা হয়। তবে এখানে দুর্গা প্রতিমার বদলে দুর্গা পটেই পূজার্চনা করা হয়। দুর্গা পটের উপর অর্ধবৃত্তাকার চালচিত্র থাকে। এই ধরনের চালচিত্রে রাম, সীতা, শিব, নন্দিভৃঙ্গি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শুম্ভ-নিশুম্ভ, অঙ্কিত থাকে। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির রাজরাজেশ্বরী দুর্গার চালচিত্রের মধ্যে অনন্যতা লক্ষ্য

করা যায়। এখানকার চালচিত্রে মাঝখানে থাকে পঞ্চানন শিব ও পাশে পার্বতী, তার একপাশে থাকে দশমহাবিদ্যা ও অন্যপাশে দশাবতার। ভারতীয় সংগ্রহালয়ের প্রাক্তন অধিকর্তা বলেছেন — বাংলায় বিভিন্ন ধরনের চালচিত্রের প্রয়োগ আছে ও তাদের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। মঠচৌরি চালির চালচিত্রে দেবীর অবয়বগুলি থাকে উপর থেকে নিচে, একটির নিচে অপরটি। আবার সাবেক বাংলা চালিতে সেগুলো থাক থাক করে আলাদা আলাদা ভাবে থাকে। অন্যদিকে, মার্কিনি চালিতে পটচিত্রগুলি থাকে পাশাপাশি।

খ) সরা চিত্র ঃ— সরার উপর পটচিত্রের আদলে বিভিন্ন দেবদেবীর চিত্র অঙ্কন করা হয়। বিশেষত লক্ষ্মী, দুর্গা, মনসা সরা বিখ্যাত। সরার উৎপত্তি মূলত বাংলাদেশের ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল জেলায়। সরা তৈরি করেন কুম্ভকার, পাল সম্প্রদায়ের লোকেরা। বাংলাদেশের যশোর জেলার কুম্ভকাররা নানা আকৃতির সরা বানান। সরা খুব উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছে বাঙালির মনে। আবার চিত্রকর হিসাবে বরিশালের খলিশাকোটা অঞ্চলের নাম রয়েছে। ফরিদপুরের সুরেশ্বরী সরা বিশ্বে স্থান করে নিয়েছে রঙের বিন্যাস ও সরু রেখার জন্য। দেশভাগের পর কিছু সরাশিল্পী পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং বিভিন্ন জায়গায় তারা ছড়িয়ে পড়েন। এরকম জায়গাগুলি হল নদীয়া জেলার তাহেরপুর, পানিহাটি, সোদপুর, দত্তপুকুর ইত্যাদি।

গ) চক্ষুষ্মান পট ঃ— মূলত পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার আদিবাসী চিত্রকররা সাঁওতালী উপকথার ভিত্তিতে সাঁওতালদের জন্মকথা পটের ছবিতে বিবৃত করেন। সাঁওতাল, ভূমিজ এবং বাংলাদেশের ভেদিয়া উপজাতির মধ্যে প্রচলন আছে জাদুপট বা চক্ষুষ্মান পটের। এই শ্রেণির পটুয়ারা ইন্দ্রজাল জানে এই বিশ্বাস থেকেই তাদের পটের নাম হয়েছে জাদুপট। আদিবাসী পরিবারের কারো মৃত্যু হলে এই পটুয়ারা দ্রুত তার ছবি এঁকে ফেলে। চিত্রটি সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ হলেও তার চোখের মণিটি থাকে না। চিত্রকর ছবিটি দেখিয়ে মৃত ব্যক্তির পরিজনদের বলে যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা পরলোকে গিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেহেতু তার চোখের মণি নেই সেহেতু সে বুঝতে পারছে না কিভাবে কোথায় তাকে যেতে হবে। যদি তাকে উপযুক্ত অর্থ ও পারিতোষিক দেওয়া হয় তবে সে অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে মণিটি বসিয়ে দিতে পারে যাতে মৃত ব্যক্তি তার পথ খুঁজে নিতে পারে। সরল আদিবাসীরা এই কাহিনী বিশ্বাস করে এবং চিত্রকরকে যথাসাধ্য অর্থ ও পারিতোষিক দিয়ে চোখের মণি আঁকিয়ে চিত্রটি সম্পূর্ণ করে নেয়। তাই এর আরেক নাম চক্ষুদান পট। জাদুপটের পটুয়ারা পশুপক্ষীসহ নানা লৌকিক দেবদেবীর ছবিও এঁকে থাকে।

ঘ) লৌকিক পট ঃ— সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ পট হল লৌকিক পট। বিষয়বৈচিত্র্যে যেমন এ শ্রেণির পটের তুলনা মেলা ভার তেমনি অঙ্কনশৈলিতেও এই পট শ্রেষ্ঠতার দাবীদার। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা, মনসামঙ্গাল সহ অন্যান্য মঙ্গালকাব্য, চৈতন্যজীবন থেকে আহৃত আখ্যান লোকশিল্পীদের তুলিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এদের শৈল্পিক দক্ষতায় মুগ্ধ সমালোচক তাই বলেন, 'লৌকিক শিল্পীর বোধ ও মার্গরীতির বোধের মধ্যে প্রকৃত অর্থে কোন গুণগত পার্থক্য ছিল না, যা ছিল তা মাত্রাগত।'

ঙ) কালীঘাটের পট ঃ— একদিকে পুরাণের কাহিনী নিয়ে কালীঘাট আর অন্যদিক দিয়ে রাজধানী কলকাতার বুকে এমন জনপ্রিয় তীর্থক্ষেত্র। যার ফলে নানা সময় নানা কারণে মানুষের ভিড় জমে। কালীঘাটের

চৌকো পটের শিল্পীরাও আসলে হঠাৎ আসা একদল গ্রাম্য শিল্পী। তারা কুমোর-সূত্রধর ও কয়েকটি পটুয়া পরিবার। মূলত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও মেদিনীপুরের শিল্পীগোষ্ঠী।

কথিত, প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় কালীঘাটের মন্দির নির্মাণ করেন এবং ১৭৯৮ সালে সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের সন্তোষ রায় এই মন্দিরকে নবরূপ দেন। এই সময় বেড়ে যায় ভক্ত সমাগমও। সে সময় জীবিকার সন্ধানে ছোটো ছোটো কয়েকদল গ্রাম্য শিল্পী নতুনভাবে বাঁচার চেষ্টা চালালো। একই সঙ্গে পটুয়া-চিত্রকরদের জাতি-বর্ণ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা। শ্রমনির্ভর কুটীরশিল্পকে আশ্রয় করে জনবহুল কলকাতার বুকে 'পাড়া' অর্থে সহজ ঠিকানা তৈরির চেষ্টা। লক্ষ্মীর সরা, মনসা ঘট, চিত্রিত হাঁড়ি, রঙিন প্রতিমা, খেলনা পুতুল, রথচিত্র অলংকরণ, চালচিত্র, ছোটো-বড়ো মন্দির নির্মাণের পাশাপাশি গ্রাম্যশিল্পীরা শুরু করেছিলেন ধাতব পাত্রের উপর সরল চিত্রের অলংকরণ।

কালীঘাটে ব্যাপক ভাবে পট তৈরির শুরুটা প্রায় ১৮৩০ সাল নাগাদ। সমাজ সচেতন রসিক হৃদয় থেকে ঠাকুর ভক্ত যাত্রী এবং ছোটোদের হৃদয়কে আনন্দে ভরিয়ে দিতো এ পট। এক ব্যতিক্রমী শিল্পমাধুর্য নিয়ে এ পট এক বিশেষ ঘরাণায় কালীঘাট অঞ্চলে বিক্রি হতো বলে এ ছবিগুলি নামকরণ হয়েছে 'কালীঘাট পেন্টিং'। মোটামুটি একশো বছর টিকেছিল এ ধারা।

কালীঘাট পটের শিল্পী প্রসঙ্গে বাঁশরী ঘোষের ছেলে ইন্দ্রমোহন ঘোষ এবং তার ছেলে নিবারণ ঘোষ ও কালিচরণ ঘোষ-এর কথা উল্লেখ করতে হয়। অন্যান্যরা হলেন বলরাম দাস, নীলমণি দাস, ভাবনা দাস। ভাবনা দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল দাস ছিলেন কালীঘাট পটের শিল্পী। নিবারণ ঘোষ ও বলরাম দাসের শিষ্য ছিলেন কালীঘাট পটের স্বনামধন্য শিল্পী রজনী চিত্রকর। রজনী চিত্রকরের সন্তানেরা হলেন রমানাথ পাল, শ্রীশ পাল, শম্ভু পাল। এর মধ্যে শ্রীশ পাল এই চর্চাকে ধরে রেখেছিলেন দক্ষতার সঙ্গে এ ধারার শেষ শিল্পী হিসেবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার আকুবপুর থেকে কালীঘাটে আসা কার্তিক চিত্রকরের বংশধারায় আছেন গদাধর, গৌরাঙ্গ, গণেশ, প্রভাস, নারায়ণ এবং নারায়ণের ছেলে ধরণীধর ও মেঘনাদ। মেঘনাদের ছেলে ঊনিশ শতকের উদয় চিত্রকর। ওই একই সূত্র ধরে ভূষণ চিত্রকর চিন্ময়ীলাল চিত্রকর। মেদিনীপুরের চৈতন্যপুর আকুবপুর থেকে কালীঘাটে আসেন প্রাক্ ঊনিশ শতকের বরেন্দ্র চিত্রকর। ভাস্কর চিত্রকর কালীঘাট পটের গঠনশৈলীকে অনুকরণ করে আধুনিকতার রং ছড়িয়েছেন। তা কালীঘাট পটের সমতুল্য হলেও অন্যভাবে সুন্দর। ঠিক যেমন এখানকার অনেক প্রতিমা শিল্পী কালীঘাট পটের অনুকরণে তাদের মতো করে পট এঁকেছিলেন। অনুপ্রেরণার অভাবে এবং বাজার চাহিদার অভাবে সেগুলিও প্রায় হারিয়ে গেছে পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পীদের জনপ্রিয়তার আড়ালে থেকে। সেগুলিও আর এক ধরনের সুন্দর। বর্তমানে কালীঘাট শৈলীর পট তৈরিতে দক্ষতা দেখিয়েছেন মুর্শিদাবাদের ঝিল্লির রাশি পটুয়ার নাতি রামপুর হাটের কালাম পটুয়া। ইদানীং অনেক পটুয়া-চিত্রকর কালীঘাট পটের অনুকরণে পট অঙ্কনে ঝোঁক দেখাচ্ছেন।

সবচেয়ে আলোচিত ও বহুল চর্চিত এই কালীঘাটের পট। মনোরম হস্ত কৌশলে অপূর্ব ছন্দ ভাবের প্রকাশ এই পট। প্রায় বৃত্তের ব্যাসের অভগ্ন ছাঁচে মোটা কালো রেখার নিখুঁত লম্বা টানে ফুটে উঠতো নারীর

শান্ত ভাব বা উত্তেজক কামনার রূপ। পুরুষ দেহের গতিশীল শক্তি বা ভগ্নরূপ। কাঁধে শাল, বকলস আঁটা জুতো, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, বাবরি চুল, পটলচেরা চোখ, ধনুকাকৃতির ভ্রূ নিয়ে 'বাবু পট' হলো মূল আকর্ষণ। এ পটে থাকে সৌখিন চেয়ার, হুঁকো, তন্বী মেয়ে, নাটকের মঞ্চ-সহ অনুষঙ্গিক নানা ধরনের বা চরিত্রের খণ্ড দৃশ্য। মূর্তির রেখাগুলির গভীরতা ফুটিয়ে তোলার জন্য মূর্তির পেছনে পরিবেশে তৈরি করা হতো রাতের অন্ধকার। মন্দির দর্শনে আসা ভক্তদের জন্য তৈরি হয়েছে হিন্দু দেবদেবী ও পৌরাণিক বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে কিছু পট। যেমন — রাসলীলা, কৃষ্ণলীলা, শিব-পার্বতী, কালী, নরসিংহ অবতার, কাকের পিঠে কৌমারী। পটের বিষয় হিসাবে ধর্মকথার বাইরে ঐতিহাসিক বিষয়ও গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন — লক্ষ্মীবাঈ, শ্যামাকান্তের বীরত্ব, শের খাঁ ও বাঘের লড়াইসহ নানা ঘটনা। সামাজিক বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে সাহেব পাড়া ও দেশি পাড়ার নানা ছবি। যেমন — সতীর দেহত্যাগ, মাছকাটা, বর-কনে, স্ত্রৈণ স্বামী, মদ্যপ স্বামীর অত্যাচার, বাবু-ভণ্ডদের বেলাল্লাপনা, বিবি সুন্দরী, সাহেব, গোরা সৈন্য। নানা চরিত্র নিয়ে ব্যঙ্গ দৃশ্য তুলে ধরে সমাজ সচেতনতার ভঙ্গি। লোকশিল্পের আঙ্গিক থেকে জনপ্রিয় শহুরে শিল্পধারায় উত্তরণই হল কালীঘাটের পটের বৈশিষ্ট্য।

—ঃ মেদিনীপুরের পটুয়াদের হাতে কালীঘাটের পটভাগ্য ঃ—

এ পট মেদিনীপুরের পটুয়ারা আগে আঁকতেন না! কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার প্রায় ৮০ বছর পরে মেদিনীপুরের পটুয়াদের হাত ধরে লুপ্তপ্রায় সেই পটই ফিরে পেয়েছে নতুন আঙ্গিক। মেদিনীপুরের শিল্পীদের আঁকা এই পট দেখতে সেকেলে কালীঘাটের পটের মতোই। সাবেক কালীঘাটের পটচিত্রের অনুকরণে ফুটে ওঠে নানা ছবি — 'মোহন্ত-এলোকেশী', 'বিড়াল তপস্বী', 'বাবু-বিবি' কিংবা 'বীণাবাদিনী'। এ ছবি আঁকছেন কারা? মেদিনীপুরের পিংলার পটুয়ারা।

বীরভূম ও মেদিনীপুরের পটুয়ারাই কালীঘাটের পটুয়াদের পূর্বপুরুষ। তাই স্বাভাবিকভাবেই, মেদিনীপুরের পটুয়াদের সঙ্গে কালীঘাটের পটুয়াদের একটা যোগাযোগ ছিল। বীরভূম এবং মেদিনীপুরের পট হল মূলত গোটানো বা স্ক্রল। আর কালীঘাটের পট হল চৌকো। তবে বাংলার অন্যান্য পটের তুলনায় কালীঘাটের পটের জনপ্রিয়তার কারণ তার আটপৌরে সারল্য। সেখানে দেবদেবীও যেন প্রতিবেশী মানুষজনের মতো। অন্যান্য পটের মতো কেবলমাত্র ধর্মীয়, পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক বিষয়গুলির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি কালীঘাটের পট। দেবদেবীর পাশাপাশি সে পটের মূল আকর্ষণ ছিল সামাজিক নানা ঘটনা, সামাজিক নৈতিক অবক্ষয় এবং তৎকালীন সময়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

আগে মেদিনীপুরের পটুয়ারা আঞ্চলিক পট আঁকতেন। যেমন — জাদুপট, সাঁওতালিপট, চক্ষুদানপট, দুর্গাপট, চণ্ডীমঙ্গলপট, গাজীপট ইত্যাদি। তবে একটু একটু করে গত এক দশক ধরে মেদিনীপুরের বেশির ভাগ পটুয়া আঞ্চলিক পটের পাশাপাশি কালীঘাটের পটের অনুকরণে ছবি আঁকছেন।

কেন এই অনুকরণ? ঃ—

মেদিনীপুরের পটের তুলনায় বাজারে কালীঘাট-পটের চাহিদা বেশি। 'এথনিক লুক' বা ঘর সাজানোর উপকরণ হিসেবে কালীঘাট শৈলীর পটের চাহিদা আছে। তাই কলকাতা থেকে শুরু করে মফসসলের বিভিন্ন

মেলায় মেদিনীপুরের পটশিল্পীরা আঞ্চলিক পটের পাশাপাশি কালীঘাটের পটের সম্ভার নিয়ে হাজির হন। পুরনো কালীঘাটের পট আজ দুর্লভ। আর পাওয়া গেলেও তার দাম আকাশছোঁয়া। তাই মেদিনীপুরের শিল্পীদের আঁকা কালীঘাটের পটের ভাল চাহিদা রয়েছে বাজারে। সম্প্রতি শুরু হওয়া রাজ্য হস্তশিল্প মেলায় গত কয়েক বছরের মতো এ বারও দেখা গেল সেই পরিচিত ছবি। মেদিনীপুরের নানা রকম পটের মাঝে ক্রেতাদের বিশেষ পছন্দ কালীঘাটের পটচিত্র।

সব ছবিগুলি পাশাপাশি দেখলে বোঝা যায় যে, মেদিনীপুরের শিল্পীরা অনুসরণ করতে গিয়েই রপ্ত করে ফেলেছে কালীঘাট শৈলীর নানা খুঁটিনাটি বিষয়। মেদিনীপুরের পটুয়াদের কাজ কালীঘাটের পটুয়াদের থেকে আলাদা হলেও কালীঘাটের পট আঁকার সময় শিল্পীরা সেই পুরনো ধারাকেই বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। যেমন — ছবিতে শেডের ব্যবহার এবং তুলির টানের সেই সাহসিকতা। পার্থক্য একটাই সে কালে কালীঘাটের পট আঁকা হত পাতলা কাগজে, এখন মেদিনীপুরের শিল্পীরা সেই পট আঁকেন আর্ট পেপারে। সেই কাগজের পিছনে আঠা দিয়ে কাপড় সাঁটা থাকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল মেদিনীপুরের পট শিল্পীদের জন্যই হারিয়ে যাওয়া এই ঐতিহ্য নতুন একটা দিক খুঁজে পেয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ—

ক) কালীঘাট পটচিত্র — উইকিপিডিয়া।
খ) আনন্দবাজার অনলাইন।
গ) পটুয়া সঙ্গীত — উইকিপিডিয়া।
ঘ) প্রমথ মজুমদার (হরিণঘাটা)।
ঙ) চালচিত্র — উইকিপিডিয়া।

লক্ষ্য ভরা জীবন

কার্তিক দোলুই (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত
জোনাকির আলো ক্ষণস্থায়ী,
হাজার স্বপ্নময়ী বক্ষে
দিশাহীন, সন্ধানহীন পথের খোঁজে।

প্রতি পদক্ষেপ অগ্রগতিতে
ভয়ঙ্কর নিশ্চুপ কঠিনতর,
মাঝে মাঝে পিছু ডাক দেয়
মায়া-মমতা, অভাব, ক্লান্তি, বিলাসিতা

তবুও ঝিরিঝিরি স্রোতের মতো
দিবারাত্রি বাহিত হয়ে
প্রবল উপেক্ষায় উপেক্ষিত
মহাসাগর মিলনস্থল চরণতলে।

বাংলার পালা কীর্তনের একাল ও সেকাল

সৌরভ মন্ডল (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

ভারতীয় সংগীতে বাংলার কীর্তন একটি উজ্জ্বল স্থান দখল করে আছে। কীর্তন প্রধানত দুই প্রকার যথা — পালা বা পদাবলী কীর্তন ও নাম কীর্তন বা সংকীর্তন। বিভিন্ন বৈষ্ণব কবি বা পদকর্তা রচিত পদগুলিকে পদাবলী বলা হয়। এই প্রাচীন পদাবলীগুলি মূলত শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন রূপ, গুণ, অবস্থান, বাল্যকাল থেকে জীবনের অন্তিম দশা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলী ও লীলা নিয়ে রচিত। এছাড়া বিভিন্ন ভক্তের জীবনচরিত, শ্রীবিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারকে কেন্দ্র করে এই পদগুলি রচিত হতে দেখা যায়। এক একটি লীলার পদসমূহকে ঘটনাক্রমে সাজিয়ে একত্রে পালা বানিয়ে কীর্তন আসরে গাওয়া হয় বলে পদাবলী কীর্তনকে পালা কীর্তনও বলা হয়।

গ্রামবাংলায় বহুল পরিবেশিত কয়েকটি পালা কীর্তন হল — শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, কংস বধ, নৌকাবিলাস, মানভঞ্জন, নিধিবনে কৃষ্ণ-কালী, পুতনা রাক্ষসী বধ, মান, দান, গোষ্ঠ, জগাই-মাধার উদ্ধার, নিত্যানন্দ মিলন, চাঁদ-কাজী উদ্ধার, ভক্ত হরিদাস, জয়দেব পদ্মাবতী, জগন্নাথের আবির্ভাব, ভক্ত প্রহ্লাদ প্রভৃতি। বাংলার কয়েকজন সুবিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা হলেন — জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, লোচন দাস, বাসুদেব ঘোষ, যদুনাথ দাস, রঘুনন্দন দাস, বলরাম দাস, রায়শেখর, বসন্ত রায়, নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য প্রমুখ। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ও সপ্তদশ শতকে এই সমস্ত পদকর্তার আবির্ভাব হয়। পালা কীর্তন যিনি পরিবেশন করেন তাকে কীর্তনীয়া বলা হয়। পালা কীর্তনে কীর্তনীয়া তার সম্প্রদায়কে সাথে নিয়ে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র যেমন — শ্রীখোল, করতাল, হারমোনিয়াম, কিবোর্ড, বেহালা, বাঁশি প্রভৃতির সহিত কীর্তন পরিবেশন করে থাকেন। পালা কীর্তনে মূল শিল্পী বৈষ্ণব পদাবলী বর্ণনা করেন এবং ব্যাখ্যার সাহায্যে বুঝিয়ে দেন জনসাধারণকে, মূল শিল্পীর সহশিল্পী হিসেবে যে সমস্ত শিল্পীগণ থাকেন তাদেরকে দোহার বা দোহারি বলা হয়। কীর্তন একক সঙ্গীত হিসেবেও গাওয়া যায় আবার সবার সম্মিলিত প্রয়াসে কীর্তন গান গাওয়া যায়। বহু মানুষের সমবায়ে গীত বাদ্য নৃত্য সহকারে কীর্তন গাওয়াকে সংকীর্তন বলা হয়। অনেক মানুষ একসঙ্গে সম্মিলিত কণ্ঠে —

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"

এই মহামন্ত্র উচ্চারণ হরিনাম সংকীর্তন নামে পরিচিত। কীর্তন আসরে যেমন সমাজের মান্যগণ্য উচ্চবিত্ত মানুষরা আসেন একই সঙ্গে চাষি, দিনমজুর, শ্রমিক কামার, কুমোর প্রমুখ মানুষরাও একই আসনে বসে কীর্তন আস্বাদন করেন। ফলে কীর্তন আসরগুলিতে সম্প্রীতির একটা বাতাবরণ তৈরি হয়। বাংলার পালা কীর্তনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মূল বিষয়বস্তু বা পালা বর্ণনা করার পূর্বে গৌর চন্দ্রিকার বর্ণনা। গৌরচন্দ্রিকা হল বৈষ্ণব ধর্মের প্রবক্তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্পর্কিত পদাবলী ও কিছু তত্ত্ব কথা।

এবার আমরা একটু আলোচনা করি পালা কীর্তনের সেকাল এবং একাল নিয়ে। বিকাশ ও বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ উন্নত থেকে উন্নততর হয়ে উঠেছে, উন্নত হতে গিয়ে কিছু ভিন্ন সংস্কৃতি বা বিদেশি সংস্কৃতিকে আপন করে নিতেও দেখা গেছে। মানুষের ভালো লাগা, মন্দ লাগা, পছন্দ-অপছন্দ সবকিছুই অনেকখানি আগেকার তুলনায় পরিবর্তিত হয়েছে। সেকালে কীর্তন মাইক ছাড়াই হারমোনিয়াম ও শ্রীখোল-করতাল যোগে পরিবেশিত হতো। বর্তমান সময়ে অত্যাধুনিক মাইক থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন — কিবোর্ড, বেহালা প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আগেকার পালা কীর্তনে বড় বড় তালের প্রয়োগ বা ব্যবহার বেশি লক্ষণীয়। শিল্পীরা বড়তাল গাইতে বেশি পছন্দ করতেন। কয়েকজন সেই সময়ের কীর্তনীয়া হলেন — নন্দকিশোর, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক দাস, গৌরী শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই মিত্র, নিমাই ভারতী, নিমাই ধারা প্রমুখ। পালা কীর্তনে ব্যবহৃত কয়েকটি বড় তাল হল — সমতাল, তেওট, দশকুসি, মধ্যম দশকুসি, রূপক, দাসপাড়িয়া প্রভৃতি। এখনকার পালা কীর্তনে লোফা, এককালি, একতালা লোফা, সমতাল, ছোট দাসপাড়িয়া, ধামাল, গড় খেমটা প্রভৃতির তালের ব্যবহার বেশি লক্ষ্য করা যায়। এগুলিও কীর্তনের আদি তাল। প্রবীণ কীর্তনীয়াদের কীর্তনেও এই সমস্ত তালের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যেত। বর্তমানে পালা কীর্তনে ভজন গানের জনপ্রিয়তা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন —

"পৃথিবীতে যত আছে নগর আদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হোক মধুর হরিনাম।।"

বর্তমান সময়ে বাংলার পালা কীর্তনের জনপ্রিয়তা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলার বহু মানুষ এই পালা কীর্তন গান করে বা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। বাংলার কীর্তন ভিন রাজ্যে এমনকি বিদেশের মাটিতেও ব্যাপকভাবে সমাদৃত। বাংলা তথা ভারতের বহু শিল্পী বাংলাদেশে কীর্তন গান গেয়ে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। এছাড়া বহু শিল্পী আমেরিকা, ইংল্যান্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে প্রবাসী বাঙ্গালীদের আমন্ত্রণে সেই দেশে কীর্তন পরিবেশন করে আসছেন। কীর্তন বাংলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পশ্চিমবাংলায় বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও একাডেমীতে কীর্তন সম্পর্কে উচ্চশিক্ষার ও গবেষণার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া কীর্তন শিল্পীদের থেকেও কীর্তন শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে।

"ভয় কি বাবা, সর্বদাই জানবে যে, ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি, আমি মা থাকতে ভয় কি?"

— শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

অপ্রয়োজনের শিক্ষা ঃ বিকাশের শিক্ষা

গৌর সূত্রধর (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ যখন কোনো কাজ করে, তখন তার মনের যে পরিচয় পাওয়া যায়; তার থেকে অনেক বেশি পরিচয় পাওয়া যায় তার অপ্রয়োজনের কাজ থেকে। যে শুধুমাত্র প্রয়োজনেই কথা বলে, অন্যসময়ে চুপ করে থাকে বা বলার যার কিছু থাকে না; তার ভাবনার, কল্পনার পরিসর যথেষ্ট কম। রবি ঠাকুর জানান, "অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে চেনা যায়।"[১] শুষ্ক হৃদয় লাভের প্রত্যাশা ছাড়া অন্য সমস্ত কিছুকেই অপ্রয়োজন বলে মনে করে; কিন্তু এই অপ্রয়োজনটি সমস্ত শিক্ষার মূল বিষয়। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা তথা শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের মনে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়াকেই বৃহৎ করে তুলেছে। কিন্তু একটা সময় পর সমস্ত প্রয়োজনের শিক্ষা ব্যর্থ হয়; যদি ছাত্রের মনে অপ্রয়োজনের শিক্ষা তথা বিকাশের শিক্ষা বিকশিত না হয়।

প্রয়োজনের শিক্ষার বাইরে অপ্রয়োজনের শিক্ষায় মানুষের মন সুগঠিত হয়, মনে সংবেদনশীলতার জন্ম হয়। শুধুমাত্র পরীক্ষা পাশের প্রয়োজনে যার বিদ্যাচর্চা, সে কখনো অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে আসবে না। কারণ অন্যের প্রয়োজন তার অপ্রয়োজন। ফলে একটা জাতি কেবল পুঁথি মুখস্ত করেই জীবন অতিবাহিত করে — না সে নিজের মননের বিকাশ ঘটায়, না সমাজের। যে সমাজে সে বড়ো হচ্ছে, রসদ সংগ্রহ করছে বেঁচে থাকার; একটা সময় পরে সে কী অবদান রাখছে সেই সমাজের প্রতি, সেই প্রকৃতির প্রতি! যাদের করের টাকায় একজন ছাত্র পড়াশোনা করছে; সমাজের প্রতি তার কর্তব্য কী! সে কী দিয়েছে বা দিতে চেয়েছে! বর্তমান সমাজের দিকে সে বিষয়ে তাকালে হতাশ হতে হয় বারংবার।

বর্তমান সময়ে পরিণত বয়সের মানুষের বেশিরভাগই শুধু প্রয়োজনের তাগিদেই ছুটছে — কেউ অর্থের প্রয়োজনে, কেউ সম্মানের, কেউ বা ধর্মের প্রয়োজনে। একমাত্র মুক্তমনা শিশুরাই কোনো প্রয়োজন ছাড়াই পাগলের মতো এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়ায়। তখন তার মাথায় কাজ করে না বৈষয়িক লাভের চিন্তাভাবনা। শিশুরা আপন মনে গঠন করে তাদের পছন্দ মতো মনোজগৎ; যেখানে সে অবলীলাক্রমে বিচরণ করে। ফলে বৈষয়িক লোকের চিন্তাভাবনার কাছে ছোটদের চিন্তাভাবনাগুলো নেহাৎ ঠুন্‌কো। অনেক সময় ছোটদের নানা কথা শিক্ষকরা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। কিন্তু এই অপ্রয়োজন-ই তাদের মনকে প্রকাশ করে, তাদের চেতনায় সংবেদনশীলতা জাগায়, তাদের স্বাধীন ভাবনায় ভাবতে শেখায়। আর যখনই কোনো শিশুকে জোর করে সমাজকথিত প্রয়োজনের শিক্ষার জন্য বাধ্য করা হয়, তখনই ঘটে বিপর্যয়। শিশুর কোমল মনের অপমৃত্যু ঘটে। ধীরে ধীরে সেও বৈষয়িক লোকের-ই মতো প্রয়োজন ছাড়া অপ্রয়োজনের কোনো চিন্তায় ভাবিত হয় না।

রবি ঠাকুরের 'বলাই' গল্পে বলাই কোন বৈষয়িক প্রয়োজনে গাছকে ভালোবাসে? তার কাকা-তো কত অনায়াসে শিমূল গাছ কেটে ফেলে। সমাজের কাছে যা অপ্রয়োজনের বলাই-এর কাছে তা প্রয়োজনের। যদি

শুধুই পুঁথিগত বিদ্যা বলাই-এর পেটে গজগজ খসখস করত; তাহলে সে এমন সংবেদনশীল ভাবনা ভাবতেই পারত না। জীবনের চলার পথকে শুধু প্রয়োজনের দ্বারা বন্ধ করলে যেমন প্রাণখুলে বাঁচা যায় না, তেমনি শুধুই প্রয়োজনের শিক্ষার পক্ষপাতী হলে মানব মনের যথার্থ বিকাশ হয় না, পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ জানান, মানুষের ভিতরে যে পূর্ণত্ব প্রথম থেকেই আছে, তারই প্রকাশ সাধনকে শিক্ষা বলে। অর্থাৎ নিজেকে জানা, নিজের পরিপূর্ণতার সাধনা তথা বিকাশের সাধনাই হল শিক্ষা। এই বিকাশ পুঁথি মুখস্থ করে হয় না, হতে পারে না। শিশু সমাজ পরিবেশ থেকে তার বিকাশের রসদ সংগ্রহ করে। স্বামীজী জানান, — 'প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাস করিলে তাহা হইতেই যথার্থ শিক্ষা পাওয়া যায়। কেবল প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারাই প্রকৃত শিক্ষালাভ হয়।"[২]

প্রকৃতির মধ্য থেকে লাভ করা শিক্ষা সমাজের কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও, তা মানব মনের বিকাশের শিক্ষা, মুক্ত চিন্তার শিক্ষা।

তথ্যসূত্র ঃ

১। 'বাজে কথা', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী ৩য় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৌষ ১৪১৫, পৃঃ ৬৮৪।

২। 'শিক্ষা প্রসঙ্গ', স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, আষাঢ় ১৩৬২, পৃঃ ২৫।

আমি সেই নারী

শুভঙ্কর মাজি (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

আমি অস্বীকার করি
লোক অপবাদের ভয়ে অগ্নিপরীক্ষা।
আমি অস্বীকার করি
স্ত্রীর মর্যাদার জন্য দর্শনী প্রদর্শন।
আমি অস্বীকার করি
স্বামীর প্রাণের বিনিময়ে বারাঙ্গনা নৃত্য।
আমি অস্বীকার করি
শর্ত রক্ষার কারণে পঞ্চস্বামী বরণ।

আমি পারি
মহাকাশে পাড়ি দিতে।
আমি পারি
দেশ শাসন করতে।

আমি পারি
যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মরতে।
আমি পারি
বৃদ্ধ মা-বাবার মুখে অন্ন তুলে দিতে।
আমি পারি
পরকে আপন করে নিতে।
আমি পারি
নতুন প্রাণের আশ্রয় দিতে।

আমি নারী
আমি সেই নারী
স্বাধীন, অপরাজেয়
আমি সেই নারী।

আমার গান আমার কথা

নীলাদ্রি চ্যাটার্জী (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

আমি একজন সংগীত শিল্পী। সঙ্গীতই আমার ধ্যান, জ্ঞান ও প্রাণবায়ু। অবশ্য ছোটবেলায় যখন অশোকনগরে পাড়ায় সাইকেল চালিয়ে বেড়াতাম বা বাড়ির ছাদে একা ছক কেটে স্ট্যাপু খেলতাম, তখন মনের কোনো অংশেই সঙ্গীতশিল্পী হবার কোনো বাসনা ছিল না। কিন্তু নিজের অজান্তেই অন্তর জীবনের ধ্রুবতারা রূপে সংগীতে জীবনের পথ নির্দেশ পেলাম। ভাগ্য অবশ্য তার দিক থেকে অনেক সাহায্য করেছে আমায়। ছোটবেলা থেকেই পেয়েছিলাম একটা সুন্দর সাঙ্গীতিক পরিবেশ এবং সঙ্গীত-এর তালিম শুরু হয় বাবার কাছ থেকেই। ৩ বছর বয়সে সঙ্গীতে প্রথম হাতেখড়ি। একদিন দেখি বাবা কাগজের ছোটো ছোটো টুকরোতে সা রে গা মা লিখে টুকরোগুলো আঠা দিয়ে হারমোনিয়ামের সাতটি পর্দায় জুড়ে দিচ্ছেন, যাতে লেখাগুলো দেখে দেখে সা রে গা মা টিপে গলায় সাতটি সুর বার করতে পারি। কিছু মাস চর্চা করার পর অশোকনগর-কল্যাণগড়-এর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শিশু সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ শুরু করি। সাথে শ্রদ্ধেয় বরুণ দাস মহাশয়ের কাছ থেকে চলতে থাকলো আমার রাগ শিক্ষা। প্রত্যেকটি রাগ-এর চেনা পরিচিত রাস্তাকে কিভাবে সামান্য গায়নশৈলীর বলে অচেনা করে দেওয়া যেতে পারে, সঙ্গীত-এর এসব কলাকৌশল-এর বিকাশে তখন মেতে থাকতাম। খেয়াল গান-এর মধ্যে শক্ত সাপাট তান, বোলতান ও দীর্ঘ আবর্তনের পাল্টা তিনতাল-এর এগারো মাত্রার মধ্যে ফেলবার বিফল চেষ্টা ও পুনরায় দুর্বার জেদ দিয়ে পূর্ব বিফলতার পুনরাবৃত্তি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার সঙ্গীত পরিবেশন-এর মধ্যে একটা গভীরতা সৃষ্টি করলো। ছোটবেলা থেকেই মঞ্চে অনেক সঙ্গীতপ্রেমী শ্রোতাদের মাঝে গান গাইতে গিয়ে ভয় পেয়েছি, গান-এর কথা অজস্রবার ভুল বলেছি (এখনো অবধি খুব সাফল্যের সাথে করে চলেছি) কিন্তু সুর ও ছন্দে তার কোনো প্রভাব লক্ষিত হতো না। এ কারণে যে কোনো নজরুলগীতি অনুষ্ঠানে আমার প্রথম পুরস্কার প্রায় বাঁধা ছিল। কিন্তু বাবা ভীষণ খুঁতখুঁতে। বাবা আমার গান রেকর্ড করতেন, তার খুঁটিনাটি খাতায় লিখতেন, তারপর বিশ্লেষণ করতেন এবং যে ভুলগুলো দিয়ে সাধারণ কানকে খুব সহসা ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারতাম, সেই ভুলগুলো আমার সামনে উপস্থিত করতেন। জানতাম, হাজার কানকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে এলেও ওই একটি জায়গায় এসে ধরা পড়তেই হবে।

2009 সালে ETV "তারানা" রিয়ালিটি শো তে টিভির পর্দায় সঙ্গীত পরিবেশন করার প্রথম সুযোগ পাই। বিচারকের আসনে ছিলেন স্বপন গুহ এবং অনুসূয়া চৌধুরী। রিয়ালিটি শো এর সেটে গান গাইবার সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। প্রথমে সাধারণ তাপমাত্রা থেকে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত শুটিং-এর সেট-এ প্রবেশ করার সময় তাপমাত্রায় হঠাৎ তারতম্যজনিত কারণে গলা ধরে যাওয়া আটকানো খুব জরুরী। দ্বিতীয়, সঞ্চালক নাম ডাকার পর মঞ্চের ঠিক কোন স্থানে এসে দাঁড়াতে হবে তা সাদা সেলোটেপে ক্রস চিহ্ন দিয়ে বোঝানো আছে। আমি

এটাকেই একটা মজার খেলা ভেবে বসার স্থান থেকে মঞ্চে আসার ব্যাপারটার অহেতুক পুনরাবৃত্তিতে মেতে উঠেছি। হঠাৎ রেকর্ডিং স্টুডিও-র অন্ধকার কক্ষ থেকে গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এলো, "এই ছেলেটা ভেলভেলেটা"। ভয় পেয়ে খেলা থামিয়ে দিলাম। আবার শুনলাম, "সামনে ২৮নং ক্যামেরার লাল আলোর দিকে তাকাও, যখন গোটা স্টেজের আলো নিভে যাবে, তুমি এই আলোর দিকে চেয়ে গাইবে। এই বিন্দুটি তোমার অডিয়েন্স। গান চলাকালীন একটা উড়ন্ত ৩৬০০ ছবি সংগ্রহকারী 'Jib Camera' পাস দিয়ে চলে যাবে, ভয় পাবে না।" আমি দুর্দান্ত ভয় পেয়েছিলাম। সরস্বতীচন্দ্র ছায়াছবি থেকে মুকেশ জি-র "চন্দন সা বদন" গান-এর অন্তরা গাইছি। সেই মুহূর্তেই ওই বিচ্ছিরি দর্শন উড়ন্ত আরশোলাটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সংগীতকে মঞ্চে একলা ফেলে বাড়ি পালাবার জন্য তখন আমি মরিয়া। শেষে বিচারক মণ্ডলীর অভয় ও স্নেহ পেয়ে কিছু বল পেলাম। সকলকে প্রণাম করে বেরিয়ে যাবো এমন সময় সঞ্চালক রাস্তা আটকে দিয়ে বললেন, "এই আমাকেও প্রণাম করতে হবে।" উত্তরে জানলাম যে, বাবা-মা শুধু বিচারকদের প্রণাম করার কথাই তো বলেছে। বাবা-মা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ছুটে এসে পরিস্থিতি সামাল দিলেন। পরে জানলাম সঞ্চালক দাদাটি আর কেউ নন, তিনি রূপঙ্কর বাগচী। এইভাবে একটার পর একটা পর্বের শুটিং-এ শুধু সকলের স্নেহ পেয়ে স্টেজে গান গেয়ে খেলা করে কাটিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলো আমাকে অনেক কিছু শিখিয়ে গেলো।

Zee Bangla Sa Re Ga Ma Pa-তে নাম দিই ২০১০ সালে। বাংলার প্রতিটি জেলায় প্রতিভা নির্বাচনের কর্মভার বহন করতেন জয়ন্ত সরকার, ঝুমুর চট্টোপাধ্যায় সহ জি বাংলার খ্যাতনামা ভয়েস গ্রুমাররা। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে কলকাতায় ৭টি "Elimination Round"-এর মধ্য দিয়ে বেছে নেওয়া শেষ ৩৪ জন প্রতিযোগীদের মধ্যে ছিলাম আমিও একজন। অনীক ধর, অন্বেষা দত্ত সহ আরও বহু সঙ্গীত প্রতিভাকে নিজ শ্রমে গড়ে তুলেছিলেন যিনি, শ্রদ্ধেয় জয়ন্ত সরকার মহাশয় আমাকে অত্যন্ত স্নেহের সাথে রাগসংগীতে প্রভূত উন্নতি সাধনে সর্বতোভাবে সহায়তা করলেন। ২০১০, জী বাংলার টিভির পর্দায় প্রথম পর্ব লঞ্চ হলো হর্ষ, উল্লাস ও কোলাহলে। সিনেমা ও সঙ্গীত জগতের মহারথীদের এতো কাছ থেকে দেখে বিস্মিত হলাম। মনে হচ্ছিল যেন এক অদ্ভুত জাদুবলে টিভির ভিতরে ঢুকে পড়েছি। চারিদিকে যেন চাঁদের হাট বসেছে। প্রথম পর্বের প্রথম গান আমাকেই গাইতে হবে জেনে বিচলিত হলাম। এতো সব ক্যামেরা, লাইট। গেয়েছিলাম মান্নাদের "জড়োয়ার ঝুমকো থেকে একটা মতি"। শুধুমাত্র গানের কথার ওপর নিরবচ্ছিন্ন মনোসংযোগ রেখেছিলাম, কারণ জানতাম সুর লয়ে ভুল হবে না। কোনোক্রমে গানটি শেষ করলাম। এখনও ভুলিনি সেই বিরল মুহূর্ত। শুনতে পেলাম হাততালিতে মুখর জনতার উচ্ছ্বাস ও মাননীয় বিচারকদের প্রশংসাবাণী। সাহস পেয়ে চোখ খুল্লাম। সঞ্চালনায় তখন ছিলেন অভিনেতা সাহেব ভট্টাচার্য। যেভাবে উনি Backstage ও Onstage-এ আমায় প্রতি মুহূর্তে অভয় দিয়েছেন, ওনার ঋণ কোনোদিনও ভুলবো না। এপিসোড-এর শেষে মোনালি ঠাকুর আমাকে শুভেচ্ছা জানালেন ও স্টেজ-এ জড়তা কাটিয়ে উঠবার কৌশল নিয়ে মূল্যবান কিছু টিপস শেয়ার করলেন। পরের রাউণ্ডে কৈলাস খেরের "Saiyaan" গান বিচারকদের পক্ষ থেকে Standing Ovation পেলাম। হৈমন্তী ম্যাম জানতে পারলেন যেকোনো গানের স্বরলিপি হারমোনিয়াম ও কীবোর্ড-এর কোন স্বরে পড়বে, সেই হিসাব আমি মুখে মুখে বলে দিতে পারি। তিনি গান গাইলেন ও সেই মুহূর্তেই সে গানের সঠিক নোটেশন বলে "দেবশিশু" অভিধা প্রাপ্ত করি।

প্রসঙ্গক্রমে একটা ঘটনা না বলে পারছি না। একবার কুমার সানু স্যার জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা নীলাদ্রি, খেয়াল অঙ্গের গান এতো ভালো গাইছো, এ গানের তালিম দিলেন কোন গুরু?" উত্তরে জানালাম, "বাড়ির অনতিদূরে বাবার বন্ধু শ্রদ্ধেয় বরুণ দাস মহাশয়ের কাছে এই গানের তালিম নেওয়া শুরু করি।" ওনার কৌতূহল বৃদ্ধি পেল। জানতে চাইলেন, "ইনি তোমার ঠিক কেমন গুরু?" আমি জানালাম, "লোকাল গুরু"। যেই না বলা, সঞ্চালক, বিচারক ও জনতার উল্লাস গর্জনে কান বধির হবার উপক্রম হলো। সানু স্যার হাসতে হাসতে জানালেন, "পাগল, গুরু গুরুই, তা লোকালই যদি হন, ক্ষতি কিছু নেই।" ততক্ষণে আমার গানের জনপ্রিয়তার সাথে "লোকাল গুরু"-র তকমা সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল। Top 10-এর নির্বাচন জনতার ভোটের মাধ্যমেই হয়েছিল। সেখানে আমার পক্ষে সর্বাধিক ভোট ছিল। এবার বিচারক মণ্ডলীতে বিরাট রদবদল হলো। মুম্বাই থেকে এলেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য ও কবিতা কৃষ্ণমূর্তি। উস্তাদ রাশিদ খান সাহেবের "আওগে যব তুম সাজনা" গান গেয়ে আবার সেরার শিরোপা পেলাম। লতা মাঙ্গেশকারের Dil Ki Rahen (1973) ছায়াছবির গান "Rasme-E-Ulfat Ko Nibhaye" গেয়ে আবার Standing Ovation পেলাম। রাঘব চ্যাটার্জী, সিধু রায় এবং রাজ চক্রবর্তী মহাশয় সকলেই উৎসাহিত করলেন। আরও কত যে এমন ঘটনা আমার স্মৃতির খনিতে চাপা পড়ে আছে তার কৈফিয়ত নিতে বসলেও রাত ভোর হয়ে যায়। কবিতা কৃষ্ণমূর্তি ম্যাম আমার পিতা-মাতার সাথে অনেক কথা বললেন। তিনি জানালেন আমার জীবনের সব থেকে বড়ো একটি স্বপ্নের পূর্ণতায় উনি আমার গান নিজে বসে শুনবেন, জেনে শিহরিত হলাম। আমার কণ্ঠে "কোন আয়া মেরে মনকে দ্বয়ারে" ও "নাতলি সে টুটা মতি রে"-র মতো গান আমারই কণ্ঠে ওনাকে গেয়ে শোনাবো, এ যেন আমার জন্ম জন্মান্তরের সাধ। দেখতে দেখতে Grand Finale অবধি পৌঁছে গেলাম। সেখানে 1st রানার আপ-এর শিরোপা প্রাপ্ত করলাম। পেলাম দেড় লক্ষ টাকার পুরস্কার।

এই নব অর্জিত সাফল্যের সাথে একটা নতুন দরজা খুলে গেল। Wild Card Entry। সর্বভারতীয় স্তরের জি. টিভি সা রে গা মা পা-তে Wild Card Entry-র মাধ্যমে নিজের সঙ্গীতকে মেলে ধরবার বহুমূল্য সুযোগ পেলাম। সেখানে অবশ্য বাংলা গান গাইতে পারবো না। গাইতে হবে মূলত হিন্দিভাষী শ্রোতাদের পছন্দের গান। সেখানে প্রথম অডিশনেই বিপাকে জড়ালাম। জি টিভি-র "Voice Groomer", মারাঠি Film Industry-র সঙ্গীত প্রাজ্ঞ Music Composer ও Pianist সঞ্জয় বিদ্যার্থী মহাশয় আমার গান শুরু হতে না হতেই থামিয়ে দিলেন। বললেন, "তুম হিন্দি গানেকো বাঙালি মাছ ভাত কি তারহা গা রহে হো। বাঙালি বাবু, হিন্দি আলফাজ বায়া কারনে কে আপনে ঢঙ হ্যা। উস তর তারিকো কো শিখো।" এছাড়া মাইক্রোফোনে নিজের নিশ্বাস-এর আওয়াজ আসতে না দিয়ে গানের মাঝে নিশ্বাস নেবার গুরুত্বপূর্ণ কৌশলটি রপ্ত করার জন্য কঠোর শ্রম শুরু করলাম। সাথে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় Lyricist শাকিল আনসারী সাহেবের কাছে শুরু হলো হিন্দি উচ্চারণের ক্লাস। অতি অল্প দিনের মধ্যে "Kayamat", "Khayal", "Galib" ও অন্য বহু শব্দের সঠিক উচ্চারণ রপ্ত করে, ও সেগুলো Mic-এ সঠিকভাবে Place করে গানের মাধুর্য অক্ষুন্ন রাখার এই জটিল প্রক্রিয়ায় লক্ষণীয় প্রগতি প্রাপ্ত করায় সকলের বিস্ময়ের কেন্দ্র হলাম। ১৮৭টি দেশে সরাসরি সম্প্রসারিত সংগীতের এই বিরাট উৎসবে অংশ নিয়েছে সারা ভারত তথা বিদেশ থেকে অনলাইন Live Audition দেওয়া

অসংখ্য বিরল প্রতিভা। বেছে নেওয়া হবে মাত্র ১৮ জনকে। বিশেষ জুরি বেঞ্চ-এ রয়েছেন আশা ভোঁসলে, এ. আর. রহমান, লতা মাঙ্গেশকার-এর মতো মহীরুহ ব্যক্তিবর্গ। সকাল-বিকেল সন্ধ্যা-রাত্রির অবিচ্ছিন্ন ধারার মতো চলতে থাকা জটিল প্রতিভা নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্লান্তিকর ধকল এবং রাতের তাপমাত্রার সার্প কন্ট্রাস্টে গলার আওয়াজে ফাটল ধরার প্রক্রিয়াটি ঠেকানোর কোনো প্রচেস্টার ত্রুটি মা করেননি। অন্তিম পর্বে মান্না দে-র কণ্ঠে গাওয়া হিন্দি ছায়াছবির এক বিচিত্র গান "ফুল গেন্ডবা না মারো" পরিবেশন করে মহাগুরু অলকা যাগ্নিক ও সহ বিচারক আদনান সামি, জাভেদ আলী ও কৈলাশ খেরের পক্ষ থেকে স্ট্যান্ডিং ওভেশন পেলাম। সারা ভারত থেকে বেছে নেওয়া সেরা ১৮-র স্বীকৃতি পেলাম।

এই মঞ্চে ভারতীয় প্রায় সকল বড়ো ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সামনাসামনি দেখার সুযোগ পেয়েছি। রাজু শ্রীবাসতাভ, আলী জাফর থেকে শুরু করে শাহিদ কাপুর, ক্যাটরিনা কাইফ, লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল ও আরও কত সব বড়ো বড়ো নাম। বিশ্বের ১৮৭টি দেশ-এর প্রবাসী ভারতীয় সহ অন্য ভাষা, সংস্কৃতির দর্শকদের মধ্যেও এই অনুষ্ঠান জনপ্রিয় হওয়ায় বলিউড-এর যেকোনো নতুন Film-এর উদ্ঘাটন ও দর্শকদের সেই ছবি সিনেমা হলে গিয়ে দেখাবার অনুরোধ করার জন্য Film Producer-সহ নায়ক-নায়িকারা এই অনুষ্ঠানটিকে বেছে নিত। সালমান খান-এর "বডিগার্ড" সিনেমার উদ্ঘাটন আমাদের সামনে হয়েছে। ওনার সাথে আমার এপিসোড ইউ টিউবে [You Tube]-এ এখনও রয়েছে। Zee TV-র ব্যানারে গাওয়া আমার গানের ভিডিওতে আমার নিজেরই কোনো অধিকার নেই এই কথা তারাই চুক্তির কাগজে লিখিয়ে নেয়। হঠাৎ কোনো এপিসোড ভিউ বেশি পেলে আমার গান ইউ টিউব মাধ্যম থেকে ওরা ডিলিট করে দেয় ও বিদেশে চড়া দামে বিক্রি করে। তাই কিছু এপিসোড হয়তো এখন নেই। যেমন শাহিদ কাপুরের সাথে আমার এতো সুন্দর মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দী হওয়া এপিসোডটি সাম্প্রতিককালে আর You Tube-এ দেখছি না। Jab We Met ছবির মোহিত চৌহানের গাওয়া "না হ্যা ইয়ে পানা" গান গেয়েছিলাম। তবে এইসি লাগি লাগন ভজন গেয়ে রামদেব বাবার আশীর্বাদ পাওয়া এবং ওনার আমাকে কোলে তুলে নেবার দৃশ্যটি টিভির পর্দায় দেখা অনেক দর্শক এখনও মনে রেখেছেন এবং সেই পরিস্থিতির আগে পরের বিশদ বিস্তৃত ব্যাখ্যার অনুরোধ প্রায়শই আমায় রাখতে হয়। কীভাবে তিনি (বাবা রামদেবজী) আচমকা আমার মোলায়েম লুচি খাওয়া বাঙালি ভুঁড়িতে হাত দিয়ে চিমটি কেটে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলছিলেন, "ইতনা চর্বি, ইতনি কম উমারমে, ইয়ে জহের হৈ, ইয়ে ইনসানকো আন্দারসে মার দেতা হৈ", এমন কথা বলেছিলেন এবং এই চর্বিকে সম্পূর্ণ ভাবে গলিয়ে ফেলার জন্য কি কি যোগাসন তিনি আমায় শিখিয়েছিলেন, তার বিশদ বর্ণনা না হয় অন্য কোনোদিন লিপির খাঁচায় বন্দি করবো।

ঘটনাচক্রে বলে রাখি, এই অনুষ্ঠানে আমি মূলত ভালো কাওয়াল [Qawal], নাত সঙ্গীত ও সুফী গায়নশৈলীতে সুদক্ষ আর্টিস্টসদের সাথে প্রতিযোগিতা করেছিলাম। আমি নিজের গায়ন বৈশিষ্টকে পৃথক রূপ দেবার জন্য Ghazal, Bhajan, Bollywood, Semi classical, Blues ও Regional Music-এর বহু বিচিত্র শৈলীর গান প্রস্তুত করি। এর জন্য আমাকে কঠোর শ্রমস্বীকার করতে হলেও অলকা যাগ্নিক আমায় "Most complete & Versatile Artist-এর শিরোপা দিলেন। সর্বাধিকবার হিরো অফ দ্য উইক-এর খেতাব

পেয়ে "TOP 4"-এ প্রবেশ করলাম। মঞ্চে এলেন শাহরুখ খান। লক্ষ্য সদ্য প্রকাশিত Ra One ছবির প্রমোশন। এই সময়, রফি সাহেবের মধুবনমে রাধিকা নাচে রে গান এ স্বনামধন্য সুরকার ও সংগীত পরিচালক যতীন পন্ডিতজীর কাছে প্রশংসিত হলাম ও সাথে সাথে আমার গানের ক্লিপ সুরেশ ওয়াদেকার সাহেব-এর কাছেও পৌঁছালো। আমার কণ্ঠে R. D. Burman সাহেবের "Masoom" অ্যালব্যামে ওনার গান "হুজুর ইস কদর' গান শুনে অভিভূত হন ও মিকা সিংয়ের সাথে যৌথভাবে অর্থসাহায্য দিয়ে আমার সঙ্গীত চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার উৎসাহ যোগান। তবে অবাক করার ঘটনা ঘটলো পরের দিন। সারারাত শুটিং চলতো মুম্বাই গোরেগাও শহরে Film City তে। সদ্য শুটিং সেরে যখন গেস্ট হাউস-এর রুমে ফোল্ডিং খাট পেতে স্বপ্নলোকের রামধনু পথে যাত্রা আরম্ভ করছি, তখন সদ্যস্নাত উষা মুহূর্ত গগনকে এক মিঠে রক্তিম আভায় রাঙিয়ে ফেলেছে। সাড়ে ৬ ঘটিকায় বাবার অকস্মাৎ জাগিয়ে দেবার কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলাম জি টিভির কর্মকর্তারা রুমে এসে ঘুরে গেছেন। তারা বাবাকে জানালেন আমি যেন নিজেকে প্রস্তুত করে ৭নং কোয়ার্টারে অপেক্ষারত একজনের সাথে দেখা করি। আমাকে দেখামাত্র একজন অভিনন্দন জানিয়ে জানালেন তিনি আমার সংগীকে ভীষণ কর্ণলালিত্যপূর্ণ বলে মনে করেন। রফি সাহেব ওনার সর্বাধিক প্রিয় শিল্পী। ওনার "মধুওয়ান মে রাধিকা" গানটি আমার কণ্ঠে তিনি ZEE TV-র সেট-এ Live শুনেছেন কিন্তু মন ভরেনি। তাই ড্রাইভ করে এতটা শ্রম করে আমার কাছে পৌঁছেছেন যাতে পূর্বের অপূর্ণতাকে ভরিয়ে তুলতে পারি। তাই একটিবার গানটি গাইবার অনুরোধ রাখছেন। আমি আনন্দের সাথে প্রস্তাবটি নিলাম ও প্রায় আধা ঘন্টার ওপরে রফি সাহেবের সাড়ে ৫ মিনিট-এর গানটির প্রতিটি লাইন-এর সম্ভাব্য লুকিয়ে থাকা সুর এর বিভিন্ন রাস্তাগুলো গেয়ে শোনাচ্ছিলাম। প্রতিটি সুরের ব্যাকরণগত দিকটা খুঁটিয়ে জেনে নিচ্ছিলেন আমার শ্রোতা। সবশেষে আমাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ দিলেন ও বাবার সাথে অনেক গল্প করলেন। পরে জানলাম তিনি আর কেউ নন, ক্রিকেটার ভিনোদ কামলি। আমি খেলা দেখতাম না, তখন সেরকম কিছু ফিল করিনি। আজ আমি ক্রিকেট খেলার অনুরাগী ও সেদিন এর সকালটা যখনি মনে পড়ে, শিহরিত হই।

খুব তাড়াহুড়ো করে সংক্ষেপে লিখতে গিয়ে আরও কত মূল্যবান ঘটনা বাদ দিয়ে চলে যেতে হলো, তার আফসোস করাটা এই মুহূর্তে বোধ করি খুব যুক্তিসঙ্গত হবে না। কারণ আমার এই একঘেয়ে লেখন ও তার ২০০০ শব্দসংখ্যা পেরিয়ে যাবার ঘটনাটি আমার নজর এড়ায়নি। ২০১২ সালে প্রথম বিদেশে অনুষ্ঠান করার সুযোগ এনে দেন সদ্য ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া আদনান সামি। সাউথ আফ্রিকার Durban ও Johannesburg শহরে মোট ৩টি অনুষ্ঠানে আদনান সামি-র সাথে একসাথে সঙ্গীত পরিবেশন করার বিরল সুযোগ পাই। কিছু সময় পর ওনার সাথে "Zee Ristey Awards for best Guru Sisya Jodi" প্রাপ্ত করি। এরপর সুরেশ ওয়াদেকার সাহেবের সাথে গুজরাটি ভাষায় ১৩টি ভক্তিমূলক গানের Album গাওয়ার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য-র মুম্বাই-এর দুর্গাপূজায় গান গাইবার ঘটনা যদি লিখতে শুরু করি তবে শব্দসংখ্যার লক্ষণরেখা অতিক্রম করে যে ঠিক কোন কুরুন্তক শহরে গিয়ে উঠবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। তাই আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করছি।

শেষে বলে রাখি, গানের সাথে সাথে পড়াশুনাও করে চলেছি সমান তালে। এমনও দিন গেছে যেখানে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ৩ দিন আগে কাঁথির মাননীয় বিধায়ক মহাশয় নিজে ফোন করে গান গাইবার অনুরোধ রেখেছেন। ফেলতে পারিনি। অভিনেত্রী রচনা ব্যানার্জী অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বভার নিয়েছিলেন ও কমিটির সদস্যরা হোটেলে পড়াশুনা করার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। West Bengal State University থেকে ইংরেজি বিষয়ে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানে Ramakrishna Mission Brahmananda College of Education-এ B. Ed. পড়বার সৌভাগ্য প্রাপ্ত করে আজ নিজেকে বড়ো বলবান বলে প্রতীত হয় কারণ ভাগ্যবল পাশে না থাকলে এরকম সৌভাগ্য শুধুমাত্র কর্মবলের অহংকারে অর্জন করা সম্ভব নয় বলেই মনে করি। এতটা করুণা ও বিবেকপূর্ণভাবে শেষ অবধি এই অপরিণত লেখক ও তার লেখার অপূর্ণতাজনিত অপরাধকে সহ্য করে যাবার জন্য ধন্যবাদ।

নিভে যাওয়া প্রদীপ

তাপস পাল (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

প্রদীপটা নিভেই গেল,
দুহাতের আড়াল দিয়েও পারলাম না ধরে রাখতে।
সন্দেহের হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে নিভে গেল।
অন্ধকার আলিঙ্গান করল,
প্রদীপটাকে।
সেই অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে
হঠাৎই আশ্চর্যভাবে পেয়ে গেলাম দেশলাইটাকে।
বেদনার কাঠিগুলো ঘষে ঘষে জ্বালাতে চাইলাম,
নিভে যাওয়া প্রদীপটাকে।
জ্বলে উঠে নিভে গেল কাঠিগুলো
অনুভব করলাম
বাতাস তখনও বইছে।
পরিত্যক্ত পোড়া বারুদ ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।
আশ্চর্য বিশ্বাসে প্রদীপটাকে
জ্বালাবার উত্তেজনায় ও জেদের বশে পাগল হয়ে একটার পর একটা কাঠি পুড়িয়ে চললাম।
ক্ষীণ আশা
যদি প্রদীপটা সত্যিই আবার জ্বলে উঠে।

সংগীত ও প্রকৃতি

ড. মানস কুমার মৌলিক (অতিথি অধ্যাপক)

পৃথিবীতে 'সংগীত' এলো কোথা থেকে? মাইকেল স্পিটজার-এর উত্তর তার 'The musical human, a history of life on earth' বইয়ে দিয়েছেন এইভাবে "সংগীতের উৎস প্রকৃতি। মানুষ তার বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন পশু-পাখির আওয়াজকে অনুকরণ, অনুসরণ করে তাকে এক পরিমিত ও সুসংহত রূপ দিয়েছে এবং চর্চার মাধ্যমে তাকে উন্নত করেছে।"

সপ্ত সুরের উৎপত্তি হিসাবে যে পুশ-পাখির ডাকগুলিকে চিহ্নিত করা হয় তা হল সরোজ (ময়ুরের ডাক), রেখাব (গাভীর ডাক), গান্ধার (স্কাইলার্কের ডাক), মধ্যম (ছাগলের ডাক), পঞ্চম (কোকিলের ডাক), ধৈবত (নাইটঙ্গেল), নিষাদ (ঘোড়া বা হাতির ডাক)।

ধ্বনি এবং ছন্দ আমাদের জীবনের এমন একটি অন্তর্নিহিত অংশ যে সংগীত ছাড়া বিশ্ব কল্পনা করা যায় না। সঙ্গীত হাজার হাজার বছর ধরে অন্যদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এই পৃথিবীতে ধ্বনির কোন অভাব নেই, কিন্তু সংগীতের উপযোগী মধুর আওয়াজ যা মনকে আনন্দ দেয় তাকে 'নাদ' বলে। আমাদের শাস্ত্রে 'নাদব্রহ্ম' কথার উল্লেখ আছে। প্রাণবায়ু ও ইচ্ছাশক্তির মিলনেই নাদের উৎপত্তি। এই ইচ্ছাশক্তিকেই উপনিষদে 'মুখ্যপ্রাণ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহাভারতে 'নাদ' বা শব্দের কারণ স্বরূপ আকাশকে কল্পনা করা হয়েছে — 'শব্দঃ আকাশসম্ভবঃ' এবং 'ছন্দ' অনন্ত সময়কে নির্দিষ্টরূপে বেঁধে রাখে। অর্থাৎ শব্দ ও ছন্দ অনন্ত আকাশ ও সময়ের মধ্য থেকে জন্ম লাভ করে আমাদের কাছে অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মের আস্বাদন এনে দেয়। ভারতীয় সংগীতকে এই ভাবেই দার্শনিকেরা ব্যাখ্যা করেছেন।

নৃতত্ত্ববিদদের গবেষণায় জানা যায়, মানুষের বিবর্তনের আজ থেকে 40,000 বছর আগে 'হোমো স্যাপিয়েন্সরা' প্রথম 'হাড়ের বাঁশি' আবিষ্কার করে যা বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কারের সূচনা।

সেই আদিকাল হতে সঙ্গীত মানব সমাজকে উৎসাহিত করেছে, সামাজিক সম্পর্ককে প্রসারিত করেছে। সঙ্গীতের মাধ্যমে মনের অনুভূতি বা 'মনের তত্ত্ব' আদানপ্রদান করা যায়। এইভাবে মানব সমাজের মধ্যে সংস্কৃতির [Culture] বিকাশ ঘটেছে; তার মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি সঙ্গীতের মাধ্যমে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেয়ার মাধ্যমে।

সঙ্গীত মানুষের মস্তিষ্ক ও শরীরকে সুর দেয়। স্মৃতিশক্তিকে উন্নত করে, 'সৃজনশীল' করে তোলে, অনুভূতিকে সূক্ষ্ম করে, শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে।

মানুষ ছাড়া অন্যান্য পাখী ও পশুদের মধ্যে সংগীতের প্রভাব নিয়েও গবেষণা হয়েছে। 'ভোকাল কর্ডের' মাধ্যমে ধ্বনিকে নিয়ন্ত্রণ [Modulate] করার ক্ষমতা মানুষের অনেক আগে পাখি, তিমি এবং বাদুড়েরা

করেছে। স্পেকটোগ্রাফ যন্ত্রে তিমি এবং পাখির গানের অ্যাকোস্টিক [Acoustic] গঠন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে তাদের স্বরগ্রামের ওঠানামা মূলত পশ্চিমের 'জ্যাজ' সঙ্গীত শিল্পীদের স্বরক্ষেপনের সাথে অনুরূপ। বিড়ালের হৃৎস্পন্দনের হার বেশি হওয়ায় তারা যেমন উচ্চলয় সম্পন্ন সংগীতের অনুগ্রাহী আবার কুকুরের শ্রবনেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হওয়ায় তারা ধীর স্থির গান পছন্দ করে।

Psychology of music গ্রন্থে পণ্ডিত কৃষ্ণ রাও বলেছেন, "It is the melody of Indian music alone that can express etarnal emotions faithfully." একথা শুধু ভারতীয় সংগীতের কথাই নয় বিশ্বসংগীতের কথাও; তা না হলে সংগীতকে বিশ্বমানবের ভাষা বলা হত না।

পাশ্চাত্যের সংগীতের সঙ্গে প্রাচ্যের পার্থক্য আছে বই কি? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "ইউরোপের সংগীতে দেখিতে পাই মানুষের সমস্ত ঢেউ খেলার সঙ্গে তাহার তাল মানের যোগ আছে, মানুষের হাসি-কান্নার সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। আমাদের সংগীত আমাদের সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়।"

আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় 'সংগীত শিক্ষাকে' বিলাসিতা বলে ধরে নেওয়া হয়। NCF-2005 প্রবর্তিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের যে পাঠক্রম তাতে সংগীতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষার জন্য যে সময়, অধ্যবসায়, পরিশ্রম একজন শিক্ষার্থী ব্যয় করে তার উপযুক্ত প্রতিদান অনেক সময়ই পাওয়া যায় না। এইভাবে সংগীতের শিক্ষা ও চর্চার থেকে পিছিয়ে গিয়ে আমরা কি ক্রমশ প্রকৃতি থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি না! কবির সঙ্গে সহমত হয়ে একদিন হয়তো বলতে হবে 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর'।

প্রতিবাদ

অঞ্জন সরকার (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

অবিচার দুর্নীতির সুবিশাল ক্যানভাসে,
আজি মুখ লুকিয়েছে সতেজ সততা।
উদারনৈতিক ভালোবাসা বিসর্জিত হয়ে,
আজ উত্থিত হয়েছে আদিম নৃশংসতা॥
দুর্বৃত্তের ধর্ষণের মুহুঃমুহুঃ আস্ফালনে,
আজ ম্রিয়মাণ হয়েছে বলিষ্ঠ মানবিকতা।
চারিদিকে বিষাক্ত বাতাসের কুটিল কম্পনে,
আজ ভাসমান হয়ে আছে ভয়ার্ত ভয়াবহতা॥
সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের পাটাতনের মতো দুর্বৃত্তরা
বিচ্ছিন্ন করেছে সকলের অধিকার নিজেদের মন মতো।
এসো, সকলে একত্রিত হয়ে মুষ্টিবদ্ধ করে শপথ নিই,
প্রতিষ্ঠা করব আমরা, আছে গণতান্ত্রিক অধিকার যত॥

একটি বিকাল

তনুময় দাস (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

(১)

সেদিনও এমনি এক বিকাল ছিল। একটা শান্ত গ্রাম ছিল। একটা ছোট্ট স্কুল ছিল। স্কুলের সামনে ছিল একটা মাঠ, একটা পুকুর। মাঠে দাঁড়ালে ওপারে রেললাইন দেখা যেত, একটা তালগাছ ছিল মাঠের ধারে, একটু দূরে ছিল খেজুর-এর সারি, স্কুল শেষের ঘণ্টাটা বেজে উঠেছিল সেদিনও, নির্ঝর-এর ন্যায় বেরিয়ে এসেছিলাম ক্লাসরুম থেকে। শান্ত, স্নিগ্ধ নৈসর্গিক প্রকৃতিকে মুখরিত করেছিলাম কলতানে। সেদিন স্কুলে একখানি রচনা লিখতে দিয়েছিল "বড় হয়ে কী হবে?" সহপাঠী জিজ্ঞাসা করল "কি লিখবি রে মন্টু। কাল যে স্যার দেখবে কী হবি বড় হয়ে।"

এই প্রশ্নের উত্তর সাধারণত একটি সপ্তম শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্র যা দেয় আমিও তাই দিয়েছিলাম, "বড় হয়ে আমি ডাক্তার হব।" সেদিন সব ছিল কিন্তু এই কঠোর রুক্ষ বাস্তব ছিল না, হয়তো ছিল কিন্তু সে সময় স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করতাম; পিতা-মাতার স্নেহ ভালোবাসা তখনও পা দুটিকে বাস্তব-এর রুক্ষ মাটিতে রাখতে দেয়নি, যদি দিত হয়ত উত্তরটা অন্যরকম হত।

আমার একখানি ছোট্ট বাড়ি ছিল। আর ছিল এক স্নেহময়ী জননী। মনে পড়ে সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে একটু দেরী হয়েছিল, সন্ধ্যে পড়ে গিয়েছিল, তুলসীতলায় মা সন্ধ্যাপ্রদীপ দিচ্ছিলেন, শুনেছিলাম তৃতীয় শঙ্খধ্বনির সাথে সাথে নাকি দেবতার আগমন হয়, দেবতা কিনা জানি না তবে সেদিন তৃতীয় শঙ্খধ্বনি শেষ হবার সাথে সাথে বাড়ির সদর দরজায় আমার আগমন ঘটে। দেবতার আগমন ঘটলে মা কী করতেন জানি না, হয়ত নৈবেদ্য সহযোগে পূজাই করতেন, কিন্তু আমার রুক্ষ কেশ, হাতে ঘাড়ে একরাশ ধুলো, অবিন্যস্ত বেশবাস দেখে তিনি যে মূর্তি ধারণ করেছিলেন, তা দেখে আমার এটাই মনে হয়েছিল 'এসো মা লক্ষ্মী' মন্ত্র দ্বারা যে শান্ত দেবীকে আমরা পূজা করি ক্ষণে ক্ষণে তিনিই ভয়ংকরী মাতা চামুণ্ডা হয়ে উঠতে পারেন বৈকি।

শাসন, বারণ, আদেশ, উপদেশ-এর অনেক ঝঞ্ঝাই আমাকে সামলাতে হয়েছিল কিন্তু সেই সবের মধ্যেও যে সেই প্রচ্ছন্ন স্নেহই ছিল তা আজ উপলব্ধি করতে পারি। সামান্য জলযোগ করে পড়তে বসেছিলাম কিন্তু আমার কানটা ওই রাস্তার দিকেই ছিল। একটা শব্দ খুঁজছিলাম, একটা অতি পরিচিত সাইকেল-এর ঘন্টার শব্দ, কতরকম শব্দই না শুনলাম, একঘন্টা গেল, দুঘন্টা গেল, মনটা প্রায় পড়ায় নিবেশ করবে করবে করছে হঠাৎ শুনলাম, এই তো সেই শব্দ এ যে আমার অতি পরিচিত, বাবা এসে গেছে। সেদিন এক স্নেহময় পিতাও ছিল, যে বটগাছের মত এক ছত্রছায়ার দ্বারা সকল বিপদ সকল ঝঞ্ঝাকে নিজের পৃষ্ঠে নিয়ে যেভাবে একটি বীজ তার কঠোর আবরণী দ্বারা ভিতরের কোমল প্রাণটিকে রক্ষা করে ঠিক সেইরূপ তার কোমল প্রাণ তার পরিবারকে রক্ষা করত। সেদিন বাবার কারখানায় ওভারটাইম হবার দরুণ তার বাড়ি ফিরতে দেরী হয়, হাত, পা ধুয়ে, মুড়ির বাটিখানি নিয়ে আমার পড়ার ঘরে এসে বসেন তিনি।

"শুনলাম, আজ দেরী করে স্কুল থেকে ফিরেছিস, দত্তদের মাঠে ফুটবল খেলতে গেছিলি নাকি?"

কী আর উত্তর দেব, চুপ করে রইলাম।

খানিকক্ষণ পরে আবার নিজেই বললেন, 'তোর মার সবেতেই বাড়াবাড়ি, সারাক্ষণ বই মুখে করে বসে থাকলেই যেন তোর মা খুশি হয়, আরে বাবা, এই বয়সের ছেলেরা ফুটবল খেলবে না তো কি বুড়ো বয়সে গিয়ে খেলবে, তবে বাবা যাই করিস না কেন পড়াশুনাটা ঠিক করে করিস, পড়াশুনা না করলে শুধু বড়ই হবি কিন্তু কোনদিনও মানুষ হতে পারবি না, ভালো মানুষ এর বড় অভাব রে বড়ই অভাব। আজ স্কুলে কি হল?"

"জানো বাবা আজ স্যার একটা রচনা লিখতে দিয়েছে, বড় হয়ে কী হব তা নিয়ে।"

"তো কী লিখবি।"

"আমি তো লিখব যে আমি বড় হয়ে ডাক্তার হব।"

সেদিন যদি বাবার মুখের দিকে একবার তাকাতাম হয়ত বাস্তব-এর রুক্ষতা সম্পর্কে সামান্য হলেও আভাস পেতাম।

(২)

আজও ঠিক তেমনই এক বিকাল। আজও সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে, পাখিদের কলতান আজও শোনা যাচ্ছে, রাস্তার ধারে গ্যাস লাইট গুলো আর কিছুক্ষণ পরেই হয়ত জ্বলে উঠবে, রাস্তার ওপাশে কোন এক ফ্ল্যাটে কোন এক গৃহবধু হয়ত তৃতীয়বার শঙ্খে ফুঁ দেবে কিন্তু ট্রাম-বাস-এর এই অবিশ্রান্ত ছোটাছুটি ও লোকজন-এর কোলাহলে সে শব্দ হয়ত বেশীদূর পৌঁছবে না। আজ বিকালেও আমি আছি, অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু আমি আজও আছি সেই সকল পরিবর্তন-এর নীরব দর্শক রূপে। আমার পরণে অশেটের বস্ত্র, মাথায় রুক্ষ কেশ, মুখে দশদিন-এর অক্ষৌরকৃত দাড়ি, আজ প্রায় দশদিন আগে আমার পিতৃদেব গত হয়েছেন, নিজের এই দুটো হাতে তাকে দাহ করেছি, শশ্মান থেকে ফেরার পর মাকে দেখেছি, এতদিন যাকে লক্ষ্মী প্রতিমা রূপে দেখেছিলাম আজ তাকে ধূমাবতী রূপে দেখে চমকে উঠেছি, কিন্তু ওই টুকুই তার বেশি কী কিছু করতে পেরেছি!

স্নাতক হয়েছি প্রায় একবছর হতে চলল। ডাক্তার হওয়া আর হয়ে ওঠেনি, সেদিন সেই অপরিণত মনের স্বপ্নটা বাস্তব-এর রুক্ষ পথে পড়ে কবে ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে। আজ আমি ঘুরছি, শুধু আজ নয় গত একবছর ধরে এমনিভাবে পথে পথে ঘুরছি। সম্বল রূপে আছে নিজের বায়োডাটা আর কিছু বস্তাপচা সার্টিফিকেট। এ দরজা থেকে সে দরজা, ওখান থেকে সেখান কত যে ঘুরেছি তার ঠিক নেই। কোথাও থেকে পেয়েছি ভর্ৎসনা, "এই Qualification নিয়ে তুমি চাকরি চাইছ, কে দেবে তোমায় চাকরি!" সত্যিই তো যেখানে প্রয়োজন-এর থেকে Qualificationটাই বড়, সেখানে কেই বা নিয়ে বসে আছে চাকরি। কোথাও আবার পেয়েছি মিথ্যা আশ্বাস, "দেখুন, এই মুহূর্তে আমাদের কোন Vacancy নেই তবে আপনার CVটা আমাদের কাছে রইল, পরে

কোন Vacancy হলে আমরা আপনাকে জানাব।" হ্যাঁ তারা নিশ্চয় জানাবে, হয়ত সেদিন স্নেহময়ী জননীকে দাহ করে আসব, তার নিজের জীবন-এর প্রতি এক ঘোর বিতৃষ্ণা নিয়ে এই পৃথিবীর রঙ্গামঞ্চ থেকে প্রস্থান এর পথ খুঁজে নেব সেদিনই হয়ত তাদের সময় হবে, তারা ঠিক জানাবে।

কলকাতায় যে মেসটায় থাকি তার দুটো বাড়ি পরেই থাকেন বিমলবাবু। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, বড় Company আছে, সকালে একবার করে প্রতিদিন মেস-এর সামনে চায়ের দোকানটায় এসে বসেন। একদিন তাকেও ধরলাম, আলাপ জমালাম, একভাঁড় চা, একখানি সিগারেট শেষ করে বললেন, "দেখো, এ বাজারে চাকরি পাওয়া, বিশেষ করে ভালো চাকরি পাওয়া তো অত সোজা নয়।" "কিন্তু ভালো চাকরি তো আমি চাইনি, এই মুহূর্তে একটা চাকরি আমার দরকার; সে যে কোন চাকরি হলেই চলবে।"

"আচ্ছা, তোমার CVটা আমায় Whatsapp করে দিয়ো, দেখি কী করতে পারি।"

CVটা Whatsapp করেছি কিন্তু তার ফল কী হল জানিনা, হঠাৎ করেই তিনি চা-এর দোকানে আসা বন্ধ করে দিলেন, মেস-এর কয়েকজন র্বোডার বলল, বিমলবাবুর নাকি চা-এ অরুচি ধরেছে, আমিও তাদের কথাই বিশ্বাস করতাম যদি না সেদিন গলির মুখে আমার সাথে বিমলবাবুর দেখা হত, এক সম্পূর্ণ অপরিচিতর মত তিনি আমাকে পাশ না কাটিয়ে চলে যেতেন। আজ আমি জানি বিমলবাবুর ঠিক কীসে অরুচি ধরেছে।

আজও একটা ইন্টারভিউ ছিল একটা প্রাইভেট ব্যাঙ্কে, অশৌচ-এর বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় পরীক্ষক-এর সামনে যখন দাঁড়ালাম, আমার ধারণা ছিল তিনি সামান্য হলেও চমকে উঠবেন, না চমকালেন না, এমনকি স্নেহার্দ্র সুরে একবারও জিজ্ঞাসা করলেন না, এই বস্ত্র পরিধান-এর কারণ। না এবার নিজেরই খুব হাসি পাচ্ছে, আমার মনটা দেখছি এখনও সেই শিশুসুলভ আছে। আজও সে একটু স্নেহ, একটু ভালবাসা, দুটি কোমল কথা চায়। যদিও সে জানে বাস্তব পৃথিবীতে স্বার্থ ব্যতীত ওই জিনিসগুলোর কোনো দাম নেই।

"আপনার Past experience আছে কী।"

"আমি Fresher, কোনো experience নেই।"

সূর্য প্রায় অস্তগামী, হেদুয়ার জলে সূর্যের রঙিন আভা চিকচিক করছে, আর কিছুক্ষণ পরই আঁধার নামবে, পাখিদের কলতান বন্ধ হবে, কোনো এক মায়াবতী কন্যা তার ঘনকৃষ্ণ কেশরাশিতে ঢেকে দেবে সমগ্র বিশ্বচরাচর, ঢেকে দেবে আমার চোখের জল, আজও সন্ধ্যা হবে, কিন্তু কোন এক অখ্যাত গ্রামের অখ্যাত বাড়িতে আজ আর সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলবে না। আজ আর কেউ দেরী করে স্কুল থেকে ফিরবে না, আজ আর সেই সাইকেল-এর ঘন্টা শোনা যাবে না, আজ আর কেউ বলবে না, "জানো বাবা, আমি বড় হয়ে ডাক্তার হব।"

"স্বাধীনতা"

কুমারজিৎ কুণ্ডু (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

"আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো।"

গল্পখানা শেষ করে ছোট্ট রবির কপালে একটা চুমু দিয়ে, আদর মাখা হাতে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা বললেন,

"নে বাবু, মানিক আমার, রূপকথার গল্প শোনা শেষ, এইবার লক্ষ্মী সোনার মতোন ঘুমিয়ে পড় দিকিনি, কাল সকাল হলে কত্তো কাজ বল তো।"

রবির শিশুমন এখন চঞ্চল। মায়ের কাছে ঘুমের কথা শুনেও তার একটুও ঘুমাতে ইচ্ছে করছে না! বারেবারে মন ছুটে যেতে চাইছে সেই রূপকথার দেশে। এই কষ্টের জীবন থেকে মাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে তার। একটু পরেই বাবা আসবে, ছোটো হলেও সে খুব ভালো করে জানে, বাবা এসেই মাকে আবার মারবে — মা আবার কাঁদবে। মায়ের চোখের জল যে রবির একদম ভালো লাগে না, তারও বুকে যে বড়ো ব্যথা হয়। একটা সাত বছরের ছোট্ট ছেলে, কিন্তু এই কষ্ট যেনো তাকে আরও কয়েক ধাপ বয়সে বাড়িয়ে তুলেছে। আলতো কণ্ঠে মায়ের দিকে চোখ মেলে রবি বলে ওঠে,

"হ্যাঁ রে মা, বাপ এসে যে আবার তোকে মারবে, তোর তো খুব লাগবে — খুব ব্যথা হবে। আমি ঘুমাবো না মা, আমি আজ তোকে বাঁচাবো, তোকে মারতে দেবনা আমি।"

তারপর ছয় মাসের গর্ভবতী মায়ের পেটে নরম স্পর্শে হাত দিয়ে আবার বলে ওঠে সে,

"আমার তো বোন হবে, বল মা! আমি কত খেলবো ওর সাথে — কথা কইব, গল্প করবো — আরও কত্তো কি। তোকে মারলে বোনও যে ব্যথা পায় মা, বাপ কি সেটা বোঝে না রে?"

রবির মুখের শেষের কথাগুলো শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না বিন্তি। ছেলেকে বুকের মাঝে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে অঝোর ধারায় কেঁদে ওঠে সে। অজ পাড়া গাঁয়ের এক মা ছেলের এই বুকফাটা যন্ত্রণাকে যেন মেঘের গরগর শব্দ এসে মুহূর্তে চাপা দিয়ে যায়। হাজার কষ্টেও তারা যেন যুগ যুগ ধরেই কেবল পরাধীন থাকার জন্যই সৃষ্টি। ছোট্ট সেই কুঁড়ে ঘরের ভিতরে থাকা, দু'জোড়া চোখের নোনা জলের সাথে তাল মিলিয়ে বাইরেও ঝমঝম করে বৃষ্টি নামে। লণ্ঠনের জ্বলন্ত শিখাটা দমকা হাওয়ার দাপটে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ভয়ে দপদপ করতে থাকে।

কাঁদতে কাঁদতে কখন যে তাদের চোখের পাতা লেগে গেছে বুঝতেই পারেনি। জোরে জোরে কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল বিন্তির।

"আরে এই মাগী, দরজাটা খোল না, বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজবো নাকি আমি এখানে? খোল নারে মাগী।"

রতন আজকে আবার মদ গিলে এসেছে। চাষের কাজ করে প্রত্যেকদিন সে সন্ধ্যার পরে আর ঘরে ফেরেনা। বাইরে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে রোজ তাড়ি, মদ, চোলাই এসব খেয়ে মাঝ রাত করে তবেই বাড়ি ফেরে, আজও তার অন্যথা হয়নি। বিন্তি ভয়ে ভয়ে উঠে দরজা খুলে দিতেই, হুড়মুড়িয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে রতন। মুখ থেকে বিশ্রী গন্ধ ভেসে আসছে তার। ঘরে ঢুকেই বিন্তির চুলের মুঠি ধরে নৃশংসতায় গর্জে ওঠে রতন।

"এই হারামজাদি, দরজা খুলতে এতো দেরি হলো কেনো হুমম? স্বামী বাইরে ভিজছে, আর তুই নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছিস?"

"দোহাই তোমার, খোকা ঘুমাচ্ছে এমনটি করো না।"

"তবে রে, আবার মুখে বুলি ফুটেছে। দাঁড়া তোকে মজা দেখাচ্ছি।"

বলেই পাশে পড়ে থাকা একটা লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করে সে বিন্তির কপালে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে বিন্তি। কপাল ফেটে কিছুটা রক্ত ছিলকে গিয়ে পড়ে রবির মুখে। রবি তাড়াতাড়ি করে উঠে পড়ে। অপরদিকে রতন বিন্তিকে যেমন খুশি ভাবে মারতে শুরু করেছে। দৌড়ে ছুটে যায় রবি। রতনের পা দুটো ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে,

"মায়ের পেটে বোন আছে রে বাপ। মারিসনি মাকে। মায়ের খুব লাগছে, ছেড়ে দে না বাপ, তোর পায়ে পড়ছি, ছেড়ে দে না!"

রতন এইবার বিন্তিকে ছেড়ে রবির চুলের মুঠিটা শক্ত করে ধরে, সজোরে ঠেলে ফেলে দেয় তাকে। তারপর মদ্যপ অবস্থায় হুংকারের সুরে বলে,

"এই শুয়োর, যদি প্রাণে বেঁচে থাকতে চাস এক্ষুনি তোর মাকে নিয়ে দূর হয়ে যা আমার ভিটে থেকে, দূর হয়ে যা!"

কথাটা শোনামাত্রই গোঙাতে গোঙাতে বিন্তি বলে ওঠে,

"ওগো তুমি আমার সাথে সাথে, খোকার গায়েও হাত তুললে? আর এতো রাতে আমরা..."

"তবে রে মাগী, আবার মুখে মুখে কথা বলছিস... দেখবি... দেখবি? তোর ছেলের নলিটা বঁটি দিয়ে কেমন কুপিয়ে দেবো?"

কথাটা শুনেই ভয়ে শিউরে ওঠে বিন্তি। মাথা ফেটে যাওয়ার যন্ত্রণা বা পেটের ব্যথা, এসব কিছুই যে কোনো মায়ের কাছে তার সন্তানের প্রাণের অধিক নয়। তাই সকল কষ্টকে মুহূর্তে বিসর্জন দিয়ে বলে ওঠে সে,

"ওগো না গো না... আমরা এক্ষুনি চলে যাচ্ছি... খোকার কোনো ক্ষতি করো না....।"

বলেই কষ্ট করে নিজের পেটটা এক হাতে ধরে কোনো রকমে ছুটে গিয়ে রবিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিন্তি। রতনের মাথায় তখন শয়তান চেপেছে, নিজের স্ত্রী-সন্তানকে জোর করে ঘাড় ধরে অমন ঘন বর্ষার রাতে ঠেলে ঘরের বাইরে ফেলে দেয়, উল্টে শাসিয়ে বলে,

"এই হারামজাদি, আর এ মুখো হবিনি, হলেই দুটোকে কেটে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেব।"

বলেই তাদের মুখের উপরে সজোরে কপাট বন্ধ করে দেয় রতন।

ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে বিন্তি। রবি তখন মায়ের কপাল থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত মুছিয়ে দিতে ব্যস্ত। বৃষ্টির জল এসে যেন বিন্তির সারা শাড়িতে রক্তের আঁকিবুঁকি দাগ কেটে দিয়ে গেছে। রবির মুখের জলটা আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বিন্তি বলে,

"তুই কেনো এই শয়তানটার সামনে গেলি বাপ, তোর কিছু একটা হয়ে গেলি আমি কি নিয়ে বাঁচতাম বলতো! ব্যথা লাগেনি তো সোনা?"

"না রে মা, আমার কিচ্ছু হয়নি... তোকে অমন করে মারলে, আমি কি চুপ করে দেখতে পারতেম বল। তোর যেমন আমি আছি মা, আমারও যে শুধু তুইই আছিস রে।"

সত্যিই না তাদের একে অপরের ছাড়া আর কেই বা আছে! ছেলের মুখে এমন কথা শুনে, চোখের জল যেন আর নিজেকে বেঁধে রাখতে পারে না। না, যা আছে অদৃষ্টে তাই হবে, আর এখানে থাকা নয়। পেটের প্রচণ্ড ব্যথা উপেক্ষা করে, কোনো রকমে বৃষ্টি মাথায় করে অতি কষ্টে গাঁয়ের একদম শেষ প্রান্তে, ভুতোদের ধানের গোলার ছাউনিতে আশ্রয় নেয় দু'জনে। খড়ের গাদায় একটু উষ্ণতা পেয়ে তাদের ভেজা শরীর দুটো ঘুমের দেশে পাড়ি দেয়।

রাত তখন কটা বাজে খেয়াল নেই, বৃষ্টি থেমে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। কালো মেঘ সরে আবার চাঁদের নীল আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে।

ঘুমটা ভেঙ্গে যায় রবির। মায়ের কোল থেকে খুব ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে, ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় সে। এদিকে কোলের কাছে নিজের খোকাকে না পেয়ে, কিছুক্ষণের মধ্যেই বিন্তির ঘুমটাও ভেঙ্গে যায়। ছেলেকে অমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, কাছে গিয়ে রবিকে জিজ্ঞাসা করে,

"কী হলো বাপ, ঘুম আসে না বুঝি? এখানে কি করছিস?"

খুব মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে উত্তর করে রবি,

"দেখ মা, চারিদিকের আকাশ কেমন পরিষ্কার হয়ে আছে। কত্তো তারা ফুটেছে। ঝিকমিক করছে সকলে কেমন।

আর ওই... ওই যে দূরে বড়ো তারাটা, ওটা তুই মা! তার পাশের ছোট্ট তারাটা আমি, আর তোর অন্য দিকে একদম ছোট্ট তারাটা, ওটা বোন।

দেখ না মা, বৃষ্টি থেমে গেছে বলে কেমন সব জ্বলজ্বল করছে ওরা। আমরাও একদিন অমন করে জ্বলজ্বল করবো দেখিস মা, সেদিন আর কোনো কষ্ট থাকবে না। আমরাও এই আকাশে স্বাধীন হয়ে যাবো। সেদিন আর ব্যথা লাগবে না — রক্ত বেরোবে না — বাপও আর আমাদের মারতে পারবে না। খুব ভালো থাকবো আমরা দেখিস মা... খুব ভালো থাকবো।"

কে শেখালো রবিকে এমন কথা বলা! মুহূর্তের জন্য ছেলের মুখে এসব কথা শুনে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিন্তি। সময়ের এই খেলার কাছে যেনো কেমন বারে বারে বোকা হয়ে যাচ্ছে সে।

ছেলের পাশটিতে গিয়ে চুপ করে বসে পড়লো। তারপর রবিকে আগলে টেনে নিয়ে বললো,

"বুঝলি খোকা, আমরা শহরে চলে যাবো। ওখানে যারা যায় তারা অনেক, অনেক ভালো থাকে। খাওয়ার কষ্ট হয় না, থাকার কষ্ট হয় না। অনেক, অনেক কিছু আছে সেখানে।"

"আমরা শহরে যাবো রে মা? সেখানে তো সকলে বলে অনেক বড় বড় বাড়ি, গাড়ি আরও কত কি আছে... আমরাও ওইগুলো দেখতে পাবো মা?"

"হ্যাঁ খোকা পাবো, সব পাবো। কাল ভোর ভোর এই সামনের বড়ো রাস্তা থেকে বাস যাবে, শহরের দিকি। আমরা মা-বেটায় ওটায় চড়ে বসবো। তারপর টুপ করে শহরে চলে যাবো (মৃদু হাসি)। আমরা আবার, নতুন করে বাঁচবো খোকা, স্বাধীনভাবে বাঁচবো।"

"কি মজা.... কি মজা... ভারি মজা হবে!"

বলেই হাততালি দিতে দিতে নাচতে থাকে রবি। পরক্ষণেই ছুটে যায় একটু সামনের দিকে, ঘাসে ফুটে থাকা কিছু বুনো ফুল তুলে ফিরে আসে আবার মায়ের কাছে। হাতের ফুলগুলো দেখায় সে। বিন্তি হেসে প্রশ্ন করে,

"এইটে দে কী হবে শুনি?"

"ধুর! তুই কিচ্ছু জানিসনি মা, দেখিসনি মন্দিরে কেমন ঠাকুর দেবতাদের পুজো করে সকলে, কেননা তারা আমাদের সকলকে কষ্ট থেকে বিপদ থেকে বাঁচায়। আর তুই যে আমাদের বাঁচালি, আমিও তাই এটা তোর জন্যে এনেছি মা। আমি তোকে পুজো করবো।"

বলেই ফুলগুলো দিয়ে বিন্তির চারিদিকে পুজো করার মতন উৎসর্গ করতে থাকে রবি। ছেলের এমন পাগলামি আর ভালোবাসা দেখে চোখের মণিগুলো শান্তির জলে চিকচিক করে ওঠে বিন্তির। এসবের মাঝে আর ঘুম হয়না তাদের। ভোরের বেলায়, আঁচলে বাঁধা কটা টাকা থেকে টিকিট কেটে দু'জনে মিলে চেপে বসে শহরে যাওয়ার বাসে, আকাশ মাঝে তারার মতোন স্বাধীন হওয়ার উদ্দেশ্যে।

বেশ কয়েক ঘণ্টা যাত্রার পর দু'জন এসে পৌঁছাল তাদের গন্তব্যে, সময় পেরিয়ে সন্ধ্যা হয় হয়। চারিদিকে শুধু আলোর ঝলকানি — এ এক বিশাল বড়ো শহর। গাছপালা নেই, সবুজ নেই! রয়েছে কেবল, বড়ো বড়ো বাড়ি, গাড়ি, রাস্তা ভর্তি লোকজন আর দুরন্ত ব্যস্ততা। এসবের সঙ্গে যে তারা একেবারেই অভ্যস্ত নয়। দুজনেই সাময়িকভাবে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে। কিছু সময় পর, একজন লোকের কণ্ঠে সম্বিৎ ফিরলো তাদের।

"কি... উদ্বাস্তু? নাকি ঘর ছেড়েছ... কোনটা? থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে? না থাকে তো আমার সঙ্গে এসো, এ শহরে কেউ না খেয়ে থেকে বাঁচে না। আর দেখে যা মনে হচ্ছে, কিছুই তো পেটে পড়েনি। সঙ্গে একটা বাচ্চা তারপর দেখছি পেটেও তো একটা ধরেছ..."

লোকটার হঠাৎ এমন আগ বাড়িয়ে সাহায্য করার ইচ্ছা দেখে কিঞ্চিৎ হতবাকই হল বিন্তি। পর মুহূর্তে নিজের মনকে বোঝালো, যে এত বড় একটা জায়গায় কোথায় সে খাবার খুঁজবে আর কোথায়ই বা একটু মাথা গোজার ঠাঁই পাবে সে? এসব তো সত্যিই সে জানে না। একা এলে না হয় তার এত চিন্তা ছিল না, কিন্তু সঙ্গে যে রবি রয়েছে। নিজের না হোক, ছেলেটার পেটে তো কিছু দিতে হবে। আগের দিন সেই রাতে দু'মুঠো খেয়েছে ছেলেটা, তারপর থেকে পেটে আর কিছুই যায়নি। তাই আর সাত পাঁচ না ভেবে বিন্তি বলল,

"আজ্ঞে বাবু, আমরা সেই দূর গাঁ থেকে আসছি। থাকার জায়গাও নেই আর কি খাব সেটিও জানি না।"

"হ্যাঁ, সেটা দেখেই বুঝতে পেরেছি। তাই জন্যই না.... এসো আমার পিছন পিছন এসো।"

বলে লোকটা এগিয়ে চলে, বিন্তি আর রবিও তাকে অনুসরণ করে। বেশ কিছুক্ষণ হেঁটে আসার পর, একটা উড়াল ব্রীজের তলায় এসে দাঁড়ায় তারা তিনজন। লোকটি একটা বড়ো থামের নিচের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলে,

"এই যে, এইটিই আজকে থেকে তোমাদের থাকার জায়গা। যদি ঠিকঠিক ভাবে কথা শোনো, পরে জায়গাটা আরো ভালো হয়ে যাবে। আর রইল কথা খাবারের, আমি দু'দিনের খাবার তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি। তবে বেশি কিছু আশা করো না, ওই একটু মুড়ি-বাতাসা — এটুকুই। তারপর মন দিয়ে যদি কাজ করতে পরো তাহলে তোমাদের খাবার সে তোমরা নিজেরাই যোগাড় করে নিতে পারবে। আর হ্যাঁ, তুমি যেহেতু পোয়াতি, কাজটা এই ছোকরাকেই করতে হবে।"

বিন্তির মনে কৌতুহল আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সে জিজ্ঞাসা করে,

"কিন্তু কি কাজ? আর আমার খোকা যে ছোট!"

"ও কাজ সে অনেক কিছুই আছে। আপাতত ধরে নাও একটু অভিনয় করতে হবে। এই যেমন ধরো, শহরে এত বড় বড় বাবুরা রোজ যাতায়াত করে। তোমার ছেলে ছোট, ঠিক মতন একটু অভিনয় করলেই তার দিকে তাকালে অনেকেরই দয়া হবে, দু'পয়সা এমনিই দেবে।"

"তার মানে ভিক্ষা? না না আমার খোকা এসব কাজ করতে পারবে না।"

"তাহলে আর কি? তাহলে মর! এ শহর কারোর খেয়াল রাখেনা। আমি নেহাৎ ভালো মানুষ, তাই একটু সাহায্য করতে এসেছিলাম। তোমাদের যখন সে সাহায্যের দরকার নেই, তখন তোমরা আসতে পারো। অন্য জায়গা দেখে নাও, তোমাদের মতন রাস্তায় এরকম অনেকেই ঘুরছে। যদি মনে করো যে শহরে দু'মুঠো খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে যেমনটি বললাম তেমনটি করো নয়তো আমি চললাম।"

এতক্ষণ পরে রবি মুখ খুলল,

"না না আপনি যাবেন নি। মা, এখানে আমরা আর কিই বা করব বল? এই বাবুটা যেমন বলছে আমি তেমনটি করতে পারব, তুই এত চিন্তা করিস নি আমাকে নিয়ে। আমি ঠিক পারব। বাবু, আপনি বলুন আমাকে কি করতে হবে... মায়ের কথা ভাববেন নি।"

মায়ের প্রতি স্নেহ — এত ভালোবাসা দেখে, বিন্তি, কেমন যেনো স্তব্ধ হয়ে গেল। সেদিনের সেই ছোট্ট ছেলেটা আজ হাঠৎ করেই কেমন যেন অনেকটা বড় হয়ে গেছে, আজ যেনো অনেক দায়িত্ব তার।

"বেশ বেশ... এইতো বুদ্ধি জেগেছে... আমার নাম সনাতন মল্লিক। শোনো হে ছোকরা, তোমায় কি কি করতে হবে..."

বলে রবিকে সবকিছু বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিছু সময় পর তাদের খাবার দিয়ে লোকটি চলে যায় আর যাওয়ার আগে দিয়ে যায় কিছু পোশাক আশাকও। এই ভাবেই বেশ ক'দিন কেটে যায়। রবিও ভিক্ষা আর লোকের কাজকর্ম করে দিয়ে যতটা টাকা পায়, তাতে তাদের দুটো পেট কোনমতে চলে যায়। মাঝে একদিন তো রবি কিছু টাকা বাঁচিয়ে মায়ের জন্য কটা ফল কিনে নিয়ে হাজির। কি! না মায়ের একটু ফল খাওয়া দরকার। কোথায় নাকি শুনেছে যে মেয়েরা পোয়াতি হলে তাদের একটু ভালো মন্দ খেতে হয়। ব্যাস রবিও তাই কিনে ফেলেছে, যতই হোক কিছুদিন পর যে তার সাথে খেলার আরেকটা সঙ্গী আসবে — তার বোন আসবে। এইটুকু একটা বাচ্চার মাথায় এত বুদ্ধি আর ভালোবাসা দেখে বিন্তিও মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায়। ভগবানের কাছে বড় মুখ করে বলে সে, আগের জন্মের কোন পূণ্য হবে, তাইতো রবির মতন একটা সন্তান সে পেটে ধরতে পেরেছে। মল্লিকবাবুও রবির খুব সুখ্যাতি করে। আর না করে থাকার জো আছে, রবি যে আকাশের সবথেকে উজ্জ্বল সেই ছোট্ট তারাটা। মাটিতে এসে ধুলোবালি মেখেও তার উজ্জ্বলতা কি এত সহজে ফিকে হবে? নাহ্! তা যে কখনোই সম্ভব নয়।

আজ সকাল থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। মা বারবার করে বলছে রবিকে, থাক আজকে আর তার কাজে গিয়ে দরকার নেই। যতগুলো টাকা জমানো আছে তাদের আজকের দিনটা হেসে খেলে চলে যাবে। আর একটু আগেই তো নেতা-মন্ত্রীর দল এসে মাইকে বলে গেছে, কালকে নাকি স্বাধীনতা দিবস তাই এই ব্রিজের তলায় যারা থাকে তাদের সক্কলকে নাকি কাল ভালোমন্দ খাওয়ানো হবে সরকার থেকে। রবিও ভীষণ খুশি কতদিন ভালো খাবার খাওয়া হয় না! সেই গাঁয়ে থাকাকালীন পাঠশালায় সে স্বাধীনতার মানে শিখেছে, পতাকা তুলেছে, লজেন্স-বিস্কুট খেয়েছে। তবে আজ সে বদ্ধপরিকর, মনে মনে ঠিক করেছে, এখন থেকেই বোনের জন্য কিছু কিছু জামা আগে থেকেই সে কিনে রাখবে। তাই তো একটু বেশি বেশি কাজ করে সে এখন। মাকে অবশেষে অনেক করে বুঝিয়ে রবি তার কাজে বেরিয়ে পড়ে।

রাত হয়েছে বেশ, বৃষ্টিটা আরও জোর কদমে চারিদিকের উন্নয়ন ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এদিক-ওদিক ভিক্ষা করে রবি যখন মায়ের কাছে ফিরল, দেখে মল্লিকবাবু কাদের সাথে নিয়ে এসেছে সেখানে। কিন্তু এটা কী হচ্ছে, এরা মায়ের মুখ বেঁধেছে কেনো? আর তারা মাকে এইভাবে সকলে মিলে ধরেই বা রেখেছে কেনো? বিন্তি রবিকে দেখা মাত্রই আরও জোরে জোরে গোঙাতে শুরু করে চাপা স্বরে। তার চোখের দুপাশ দিয়ে জলের ধারা বয়ে চলেছে অনবরত।

"এই বাবু, আপনি মাকে অমন করছেন কেনো? এই বাবুরা কারা?"

ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে রবি, হাত থেকে পড়ে যায় মায়ের জন্য কিনে আনা ফলের প্লাস্টিক ব্যাগ আর বোনের নতুন লাল রঙের ফিতে বাঁধা জামাটা।

"তোর মায়ের অনেক জ্বালা রে ছোকরা, সে জ্বালা নিভিয়েই আমরা তোর মাকে স্বাধীন করতে এসেছি আজকে।"

বলেই এক পাশবিক কণ্ঠে হেসে ওঠে মল্লিকবাবু। তার পাশে থাকা একজনকে হুকুমের স্বরে বলে,

"এই বাদল, এই কচি পাঁঠাকে টেনে নিয়ে আয় আমাদের গুমটির ওখানে, আজকে ও দেখুক ওর মাকে কেমন করে আমরা স্বাধীন করি।"

কথাটা শেষ হতে না হতেই সকলে মিলে বিশ্রীভাবে হেসে ওঠে। কিছুক্ষণের মধ্যে, তারা রাতের অন্ধকারে টেনে নিয়ে চলে বিন্তি আর রবিকে তাদের আস্তানায়। ছোট্ট সন্তানের সামনে এতো গুলো জানোয়ার মিলে বিন্তির শরীরটা নগ্ন করে, এক একবার মিলে ধর্ষণ করে। একে গর্ভবতী তার উপরে এই রকম ভয়ঙ্কর নির্যাতন! সহ্য করতে পারে না বিন্তি। গর্ভপাত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে সে। রবিকে এতক্ষণ হাত মুখ বেঁধে শুধু এই নৃশংস দৃশ্য দেখার জন্যই ফেলে রেখে ছিল তারা। অঝোর ধারায় কেঁদে চলেছে রবি। মল্লিকবাবু তার হাতটা বিন্তির নাকের কাছে এনে যখন বুঝলো যে আর শ্বাস পড়ছে না, তখন একবার বিকট ভাবে হেসে উঠে রবির দিকে ফিরে বললো,

"এই যে... এই দেখ, কাল স্বাধীনতার আগেই তোর মাকে কেমন স্বাধীন করে যমের দুয়ারে পাঠিয়ে দিলাম। (হা হা) এই যে তোল মাগীটাকে। প্রথম দিকে দেখা থেকেই মুখের নাল আর সামলাতে পারছিলাম না। যাক আজকে আয়েশ করে খাওয়া গেলো সকলে মিলে... নে নে তোল শালীকে আর এই পাঁঠাটাকেও... সারা দিন খালি ম্যা মা করা... (হা হা)। এই ব্রিজের তলায় ফেলে রেখে আসি চ। তারপর কদিন গা ঢাকা দিয়ে দেবো। কাল তো পিন্টুদার পার্টি থেকে খাওয়াবে, গিলে টিলে আমরা সাইড হয়ে যাবো, দাদাই সব সামলে নেবে। চল বে।"

বলেই সকলে মিলে তাদের দু'জনকে নিয়ে ব্রিজের তলায় সেই থামটার কাছে গিয়ে ফেলে দিল। যাওয়ার আগে মল্লিকবাবু রবির বাঁধন খুলতেই জমে থাকা কান্না ও ক্ষোভ বেরিয়ে এলো রবির গলা থেকে,

"শয়তান, তোদের আমি মেরেই ফেলবো... কী করে দিলি তুই। মেরেই ফেলবো আমি....."

সজোরে এক চড় কষিয়ে দিলো বাদল রবিকে। তারপর মল্লিকবাবু রবির উদ্দেশ্যে বললো,

"কিছু করতে পারবিনা না রে ডিবগে তুই আমার.... তোকে তো ছেড়ে দিলাম... যা যা.... পুলিশ ডেকে আন গে যা.... ভাগ শালা.... আমাকে নাকি মারবে।"

বলেই রবিকে সজোরে একটা লাথি কষালো মল্লিকবাবু। থামের কাছে গিয়ে আছড়ে পড়ে সে। তারপর সকলে মিলে বাইক নিয়ে বেরিয়ে যায় সেখানে থেকে। তারা চলে যেতেই, রবি খুব কষ্টে পেটটা ধরে, মায়ের মৃতদেহটার সামনে গিয়ে বসে। মুষলধারে বৃষ্টিতে রাস্তায় জমা জল এসে রক্তগুলো ধুইয়ে দিয়ে যাচ্ছে বিন্তির।

"এই মা, চোখ খোল না রে... কই রে... তাকা না মা... দেখ... দেখ কত ফল কিনে এনেছি... বোনের জন্য নতুন জামাও কিনে এনেছি... এই মা তাকা না... তোকে যে আমি বাঁচাব বলেছিলাম মা... ছেড়ে যাস না মা... তাকা না...।"

অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকে রবি। এক সময় চোখের জল মুছে বলে,

"নাহ্, এটা হতে পারে না... ওদের শাস্তি হবে রে মা... আমি পুলিশের কাছে যাবো ওরা শাস্তি পাবে... তুই একটু ঘুমো। হ্যাঁ মা... আমি এক্ষুনি আসছি...।"

বলেই ছুট লাগার রবি... রাস্তা ভর্তি জল... ঘোর বর্ষায় চারিদিক আবছা হয়ে এসেছে... দৌড়ে দৌড়ে এক সময় বড়ো রাস্তায় এসে পোঁছায় রবি। মনে তখন তার একটাই চিন্তা, ওই শয়তানগুলোকে শাস্তি দিতেই হবে... তবেই মা শান্তি পাবে... বৃষ্টির প্রকোপ খুব বেড়েছে... স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না তবুও ছুটে চলেছে সে... মা যে তার এমন স্বাধীনতা চাইনি... শুধু একটু বাঁচতে চেয়েছিল... কিন্তু একি হয়ে গেলো! এসব ভাবতে ভাবতেই রাস্তার মাঝে এসে পড়ে রবি... কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটা দুরন্ত লরি এসে মুহূর্তের মধ্যে পিষে দিয়ে যায় সেই ছোট্ট প্রাণটিকেও। উজ্জ্বল সেই তারা... এক পলকেই নিভে যায়। রক্তের অভিষেকে শহরের রাজপথে রবির অস্ত ঘটায়, নিভে যায় সেই আলো।

স্বাধীন কী আমাদের সত্যিই এ সমাজ করে তেলে? নাহ্... স্বাধীনতা কেবল মৃত্যু দিতে পারে... আর এ মৃত্যু দিতে জানে এই সমাজ... তাই এটা ঠিকই স্বাধীনতার রচনা এই সমাজই করে... রক্ত না খেলে যে স্বাধীন হওয়ায় যায় না... মৃত্যু ছাড়া যে স্বাধীন হওয়া যায় না।

"এ শহর লিখছে স্বাধীনতা, রক্ত মাখছে গায়ে
তোর এ সমাজ আজ গিলছে দেখরে আমায়...
আগুন জ্বলছে,
গরল ছুঁড়ছে.....
তবু বিষের নেশায় আমি ছুটছি বারেবারে...
তোদের পুলিশি শিকল
আমাদের পায়ে পায়ে....."

গর্ভবতী মাকড়শা

অনুপ পাঁজা (ছাত্র, বি.এড. দ্বিতীয় বর্ষ)

গর্ভবতী মাকড়শা
যতই শত্রু হোক্
তাকে কি মারা যায়?
সে তার ছেলে-পুলেদের মানুষ করতে না
পারলেও
তাকে কি মারা যায়?

শত্রুর সংখ্যা যতই বাড়ুক্
তার বিষ যতই তীব্র হোক্
যতই তার মনে কালিমা থাক্
তাকে কি মারা যায়?
অসংখ্য মানুষ তো মরে গেছে ওদের বিষে
একটু সংকেতেই হাজার হাজার মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়াতে
পারেনি এখনও —, স্থির হয়ে বসে কথা বলতে পারেনি
ঘুম, শুধু ঘুম —
জীবন হাতের মুঠোয় করে প্রতীক্ষায়
থাকতে হয়েছে দিনের পর দিন
বিগত মাসগুলোতে বৃষ্টির শব্দে ও
হিমেল হাওয়ায় মানুষগুলো ছটপট
করেছিল যন্ত্রণায়। শুধু যন্ত্রণায়
আর সঙ্গে গর্ভিনী মাকড়শা
মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে সবুজ রক্ত, মাথা দিয়ে নীল স্রোত,
সঙ্গে ছিল একটু 'মৃদুলা ঝড়'

যদিও টাইফুন বা হাসি-রবের রক্তকরবী নয়
তা সত্ত্বেও এড়িয়ে যাওয়া নয়
বিদ্যুতের জোরালো চমকানিও ছিল
একটু, একটু ভয় পাইয়ে দেবার।
তবু সে গর্ভবতী, তবু সে সন্তান সম্ভবা;
তার গর্ভে সন্তান, প্রাণাধিক প্রাণ-সত্তা
শুধু প্রসবের অপেক্ষা
নিষ্পাপ কালিমাহীন শিশুরা
কিলবিল করছে যেন হাতের কাছে
স্বপ্নের মতো উদাত্ত নৃত্যে ছটপট করতে থাকে
ওদের হৃদয়স্ফীত দেশ
যতই শত্রু হোক্
তাকে কি মারা যায় — একেবারে হত্যা।
হয়তো একদিন তার দেশ বদল হবে
হয়তো একদিন তারা একরোখা হয়ে বিন্দুর আলোয়
প্রথম প্রত্যূষে নীলাকাশ দেখবে আর চমকে যাবে
তাদের সন্তানাদির অদ্ভুত পুনরাবৃত্তি

বুঝবে আমাদের বড়ো হওয়া প্রয়োজন
যার জন্য বেঁচে থাকা
বাঁচার লড়াই
শুধু একার জন্য নয়
প্রত্যেকের প্রতিনিয়ত —
স্ফটিক হাওয়ায় একদিন তাদের
স্নান হবেই
রোদে পিঠ শুকোবে
পৃথিবীর জলে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে
তাদের সব অভিমান
একদিন নিশ্চয় তাঁরা সবাইকে ভালবাসাবে
ভালবাসবে।।

এক শীতের সন্ধ্যায়

বিকাশ ধাড়া (ছাত্র, বি.এড. দ্বিতীয় বর্ষ)

এক শীতের সন্ধ্যায় আমি, সুমন আর বুদ্ধ। আমাদের গ্রামের পুরাতন শিবের মন্দির প্রাঙ্গণে আগুন জ্বালিয়ে বসে আছি। এই শীতের সময়টা আমরা সব বন্ধুরা মিলে সন্ধ্যায় এক সাথে বসে গল্প করি। বলে রাখি, পড়ার সূত্রে এখন সব বন্ধুরা শহরে থাকি, তো ডিসেম্বর মাসের শেষে কলেজের ছুটিতে সব বন্ধুরা গ্রামের বাড়িতে ঘুরতে আসি। কিন্তু আজকের সন্ধ্যাটা অন্যদিনের তুলনায় একটু আলাদা। কারণ সূর্য পশ্চিমে ডুব দিতেই কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন, আর শীত যেন কামড় বসিয়েছে, তাই আজকে সব বন্ধুরা আসেনি, শুধু আমি, সুমন ও বুদ্ধ বসে আছি আগুন জ্বালিয়ে। সুমন বলল, এই ঠাণ্ডায় আর কেউ আসবে বলে মনে হয় না। আমি জানি সুমন চিরকালই ভীতু, তাই আমি একটু সুযোগ পেয়ে বললাম — সুমন তুই ভূত দেখেছিস কখনো? সুমন কাঁপা কাঁপা গলায় বলে ভূ-উ-উ-ত, রাম-রাম-রাম। এখন আবার এই সব কেনো? আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা বাইক-এর আওয়াজ পেয়ে রাস্তার দিকে ঘুরে তাকাতেই দেখলাম, বাইকটা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো। একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে বাইক থেকে নেমে দাঁড়ালো সুজনদা। কিরে কি করছিস তোরা? কথা প্রসঙ্গে বলে রাখি সুজনদা আমাদের আড্ডা ঘরের সিনিয়র। আমি ও সুমন একসাথে শহরে পড়াশুনা করি, আর বুদ্ধ সংসারের চাপে পড়া ছেড়ে কাজ করে। আমরা বললাম, এই একটু ভূত নিয়ে আলোচনা, সুজনদা বলল — ও আচ্ছা, আমি বললাম, সুজনদা তুমি কখনো ভূত দেখেছো? সুজনদা, নারে ভূত দেখিনি, তবে কিছু অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি। শোন তাহলে —

আমি তখন রামনগরের একটি ঔষধ দোকানে কাজ করতাম। সেদিন দোকানে কাজের লোক কম থাকায় মালিক কিছুতেই তাড়াতাড়ি ছাড়তে চাইল না, প্রায় ৯টা নাগাদ মালিক ছুটি দিল। তাড়াতাড়ি করে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে বাইকে পা দিতেই দেখি আকাশে মেঘ ডাকতে শুরু করলো। তাই তাড়াহুড়ো করে বাইকে স্টার্ট দিয়ে মাঠের শর্টকার্ট রাস্তাটা নিলাম। এই রাস্তাটা একটু নির্জন ও অন্ধকার, লোকজন নেই বললেই চলে। বেশ কিছুটা রাস্তা যাবার পর হঠাৎ কেন জানি আমার মনে হতে লাগলো কেউ বা কারা যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ি থেকে নিচে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তারপর আমি গাড়ির গতি কিছুটা কমিয়ে চালাতে থাকি, আর মনকে বোঝানোর চেষ্টা করি হয়তো বাতাসের কারণে হতে পারে। হঠাৎ গাড়িটি বাজে ভাবে আর্তনাদ করে খটখট শব্দে থেমে যায়। আমি মনে মনে ভাবলাম কি হলো রে বাবা? এরপর বার বার চেষ্টা করলাম গাড়িটিকে চালানোর। কিন্তু সব চেষ্টায় ব্যর্থ হল, কুয়াশার গাঢ় অন্ধকারে আমার মোবাইলের টর্চটি জ্বালিয়ে দেখলাম সামনে একটি অশ্বত্থ গাছ ও তার পাশে একটি শ্মশান। সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো কেউ বা কারা যেন আমার উপর নজর রাখছে। তার পর দেখি এক বয়স্ক লোক হঠাৎ আমার পাশে এসে দাঁড়ায় আর জিজ্ঞাসা করে বাবু রামনগর যাওয়ার রাস্তাটা কোন দিকে বলতে পারেন? আমি ইশারায় আমার পেছনের দিকের রাস্তাটা দেখিয়ে দিই। ঠিক পর মুহূর্তে পেছনে ঘুরে দেখতেই শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে

যায়। দেখি রাস্তায় কেউ নেই, মোবাইলে টর্চ ভালো করে ফেলতেই দেখতে পাই, শ্মশানের সামনে থেকে হাল্কা ধোঁয়া উঠছে, আর তার পাশে কিছু পোড়া কাঠ, কয়লা পড়ে আছে। বুঝতে পারি খানিক আগেই কাউকে দাহ করা হয়েছে, এবার আমি ভয় পেতে শুরু করলাম, আমি কিছু সময়ের জন্য থমকে গিয়েছিলাম, আর হাওয়া দেওয়ার ফলে শ্মশানে আধ ভেজা কাঠ ও পাঁশগুলো এক সাইডে পড়ে থাকে, আর পাঁশগুলো থেকে ধোঁয়া উড়তে থাকে। আর থমকে যাওয়া আমি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে দেখি অনেকটা সময় বয়ে গেল। তাই তাড়াহুড়ো করে বাইকটি চালানোর চেষ্টা করি। বার কয়েক চেষ্টা করার পর গাড়িটি স্টার্ট নেয়। কোন রকমে রাস্তাটি পার করে সন্দীপদার চা দোকানে গিয়ে উঠি। সন্দীপদাকে এক কাপ চা ও সিগারেট বলি। সিগারেট ধরানোর পর সন্দীপদা জিজ্ঞাসা করে, কি বাবু আজ এত দেরি কেনো? প্রশ্নের উত্তরে আমি রাস্তায় ঘটে যাওয়া পুরো ঘটনা টা খুলে বলি। তারপর সন্দীপদা বলে জায়গাটা ভালো নয়। বাবু, সন্ধ্যের পর ওই রাস্তায় যেই যায় সেই কোনো না কোনো বিপদে পড়ে। তাই রাস্তাটা সবাই এড়িয়ে চলে। আমার দোকানে বসে অনেককেই আলোচনা করতে শুনেছি ওই শ্মশানের আশেপাশে নাকি তেনাদের দেখা যায়। আপনি ভালো ভাবে ফিরে এসেছেন এটাই অনেক। তারপর বাড়িতে ফিরে গেলাম ঠিকই। কিন্তু সারা রাত আর আমার ঘুম হল না। মন ওই শ্মশানেই পড়ে আছে, যেন বারংবার মনে পড়েছ সেই ভৌতিক ঘটনা। এই ঘটনা শোনবার পর সবাই থমকে গেল। সুজনদা বলল, কি রে কি হল সবার। সবাই না, না, না — তো কিছু হয়নি। তারপর সুমন বলল, বিকাশ তুই কি বলবি বলছিলি না সেদিন ফোন করে, ও হ্যাঁ মনে পড়েছে আমি বললাম, ২-৩ বছর আগের ঘটনা। আমি কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করি, তাই খুব একটা বাড়ি আসিনা, আমি একদিন ছুটিতে বাড়ি আসলাম, আগের দিন রাতে বন্ধুরা হোস্টেলে রাতে খাবার পর সবাই মিলে আড্ডা মারছিলাম। আর আড্ডার টপিক হল ভূতের গল্প। তার মধ্যে অনেক বন্ধু ভূতের গল্প শুরু করল, কেউ বলল, জানিস তো হোস্টেলের ছাদ থেকে পড়ে একটা ছেলে মারা গেছে। তো ছাদে উঠে দেখবি কোণের দিকে একটা বাড়ি আছে, সেই রুমে ওইখানে ছেলেটা থাকত, রাতে ওই খান থেকে চিৎকার শুনা যায়। আর ওই কোনো আলো জ্বলে না, কারণ বাল্ব লাগালে আকস্মিক ভাবে বাল্ব কেটে যায়, তাই ওই রুমে অন্ধকার থাকে সবসময়। আর ছেলেটা পড়াশুনায় মনে হয় অনেক ভালো ছিল, তাই রাত ১২টার পর ওই রুম থেকে পড়ার আওয়াজ শোনা যায়। আমি বললাম, জানি না তবে ওই রুমটা কেমন যেনো আমার যেতে ভয় লাগে। এই কথায় সবাই সহমত হল। এইভাবে অনেক রাত হল গল্প করতে করতে, আমি বললাম, জানিস তো আমার দাদা বলছিল যে, সে মাঠে যায় ভোরবেলা জল ছিঁচার জন্য, দাদার নিজের নামে অনেক জমি আছে; তাই ভোর ভোর হলে কাজে চলে যেতে হয়। তাই তার সাথে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল —

শীতের ভোরে তার বন্ধু ডাকতে আসে একসাথে জমির কাজে যাবে বলে, সে টাইম না দেখে চলে যায় তার বন্ধুর সাথে জমিতে জল ছেঁচার জন্য। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপারটা হল সে তিন থেকে চার ঘন্টার কাছাকাছি জল ছেঁচতে থাকে, সে ও তার বন্ধু। দাদা ভাবল, শীতকালের ভোর বোঝা যাচ্ছে না, তাই হয়ত কুয়াশা ঘিরে রাখার ফলে সূর্যকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু হঠাৎ তার বাবা খোঁজাখুজি করতে করতে দাদাকে ডাকতে শুরু করে, দাদা বলল, কি হয়েছে বাবা? বাবা বলল, আমাকে ডাকলি না, একা একা চলে এলি মাঠে?

দাদা বলল, কই আমার সাথে বন্ধু আছে তো, আমরা একসাথে এসেছি। বাবা বলল, কই তোর সাথে কেউ নেই তো, দাদাও সাইড ঘুরে দেখতে পেল কেউ নেই, সে বাবার কাছে টাইম জানতে পারল ছয়টা বাজে। কিন্তু তার কাজে আসার কথা পাঁচটা তিরিশে বা ছয়টায়। সে ভাবল আমি তাহলে এত রাতে কি করতে এলাম বা কার সাথে এলাম। এই বলে আমার দাদা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তারপর তাকে বাড়ি নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হল। তারপর সবাই বলল, আর না এবার ঘুমাতে হবে। তখন ঘড়ি দেখি তিনটে তিরিশ বাজে। তো সবাই ঘুমাতে গেলাম।

তারপর .... আমার বন্ধু, আমার বাড়ির কাছেই বাড়ি, সে হঠাৎ ফোন করে বলে, কিরে বিকাশ কেমন আছিস? কেমন পড়াশুনা চলছে? এখন তো ভুলেই গেছিস। আমি বললাম, নারে সুদীপ আমি তো ভুলিনি, আমরা ছোটো থেকে অনেক সময় একসাথে কাটিয়েছি কি করে ভুলে যাব তোকে? ওকে। বাড়ি গেলে দেখা করব তাহলে। হঠাৎ ঘুম ভাঙলো, মনে মনে ভাবলাম, এতক্ষণ তাহলে স্বপ্ন দেখছিলাম। দূর---- কি অবস্থা----। তো পরের দিন আমার বাড়ি যাবার কথা, রাতে দেরি করে ঘুমানোর জন্য দেরি করে উঠলাম, আর লাস্ট বাসে চেপে রওনা দিলাম। বলে রাখি, আমার বাড়িটা হাইরোড বাসস্ট্যাণ্ড থেকে অনেকটা দূরে। ১০টা নাগাদ বাস থেকে নামার পর সুদীপকে ফোন করলাম। সুদীপ ফোন তুললো না। আমি আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে যেতে লাগলাম, তারপর কিছুটা দূরে সুদীপ দেখি দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, ফোন তুলিসনি কেন? সুদীপ ঘাবড়ে বলল, খেয়াল করিনি। সুদীপ আমার বাড়িতে পৌঁছে নিজেই বাড়িতে চলে গেল। এতটা রাস্তা আসার পর আমিও খেয়েদেয়ে আবার ঘুমিয়ে গেলাম। পরের দিন মা জিজ্ঞাসা করলো, তোর সাথে ওটা কে ছিল? আমি বললাম, কেনো ওটা সুদীপ আবার কে? মা বলল, পাগল আছিস নাকি? আমি বললাম, কেনো কি হল? আরে সুদীপ পরশু দিন মারা গেছে, আমি বললাম, বল কি! মা বললো, হ্যাঁ, আর বলল, মনে হয় সুইসাইড করেছে। আমি বললাম, বল কি? আমি তো ভয়ে কাঁপতে শুরু করলাম। তারপর গুনিনকে ডেকে আমাকে একটু ঝাড়িয়ে দিল আর একটা বিশাল বড়ো কবচ বেঁধে দিল। এসব গ্রামের কু-সংস্কার। তারপর থেকে বেশ কিছুদিন আমার ঠিকভাবে ঘুম হতো না। সুমন ও বাকি সব অবাক হয়ে তাকাতে লাগলো আমার দিকে।

"আমি ছাড়া মা আর কেউ আছে নাকি? সব মেয়ের ভিতরেই আমি। সব মায়ের মধ্যেও আমি রয়েছি। যেখান থেকেই আসুক, সবাই আমার ছেলেমেয়ে। মা বলে ডেকে যারাই আমার কাছে আসে, তারা সবাই আমার ছেলেমেয়ে। এই সত্যি — সত্যি জানবে।"

— শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

আধুনিক ভারত ও বক্সিং – একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

বৈজয়ন্ত মজুমদার (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

মুষ্টিযুদ্ধ বা Boxing-এর ইতিহাস ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বেশ প্রাচীন। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন সাহিত্যিক বা প্রত্নশৈল্পিক উপাদানে তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত মুষ্টিযুদ্ধের সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে মহাভারত এবং রামায়ণ কিংবা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-এর কথা। বেশ কিছু প্রাচীন স্থাপত্যশৈলীর পৃষ্ঠে প্রাপ্ত ভাস্কর্য থেকেও জানা যায় যে, ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে শুরু করে পশ্চিমে পারস্য অথবা পূর্বে চীন, দক্ষিণ-পূর্বে এশিয়া এবং জাপানে বিভিন্ন ভাবে মুষ্টিযুদ্ধের প্রচলন ছিল। ভারতের প্রাচীন মুষ্টিযুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, জুজুৎসু বা কলারিপায়াত্তু জাতীয় প্রাচীন মার্শাল আর্টসের মত এই লড়াইয়ে হাত বা মুষ্টি খোলা থাকত না — বন্ধ থাকত; মুষ্টি বন্ধ যুদ্ধ — তাই মুষ্টিযুদ্ধ। ষোড়শ মহজনপদের যুগ থেকে শুরু করে প্রায় খ্রিষ্টীয় নবম-দশম শতক পর্যন্ত মুষ্টিযুদ্ধ সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। এর মূল কারণ, সেই সময়ে রাজপুত্রদের শস্ত্র ও শাস্ত্র শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ ছিল এই ক্রীড়া। সমাজে কিছু বিশেষ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং উচ্চস্তরের ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্যান্য বর্ণের মানুষজনের কাছে এই ক্রীড়াশিক্ষার খুব একটা উপযোগিতা কিংবা প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তবে এই ক্রীড়া প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সমাজে বিনোদন হিসেবে কিংবা প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া হিসেবে কতটা স্থান করেছিল, সেই বিষয়ে ঐতিহাসিকরা এখনও নিশ্চিত নন।

বিনোদন এবং প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া — এই দুই হিসেবে মুষ্টিযুদ্ধের আত্মপ্রকাশ আধুনিক সময়ের পাশ্চাত্যে। যদিও এর উদ্ভব ঊনবিংশ শতকের মধ্যবর্তী দশকের শিল্পবিপ্লব এবং উপনিবেশবাদে জর্জরিত ইউরোপ, এর সর্বোপরি বিকাশ [Professional এবং Amateur boxing হিসেবে) এবং জনপ্রিয়তা প্রাপ্তি বিংশ শতকের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। এই মুষ্টিযুদ্ধ প্রাচীনকালের মুষ্টিযুদ্ধ বা মার্শাল আর্টসের থেকে ভিন্নতর। প্রথমদিকে খালি হাতে [Bare Knuckle] লড়াই হলেও একটা সময়ের পর থেকে গ্লাভস [Gloves] / দস্তানা-এর ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে — এর মূল কারণ প্রতিদ্বন্দ্বীদের শারীরিক আঘাত থেকে যথাসম্ভব নিরাপত্তা। দাঁত বাঁচানোর জন্য মাউথ গার্ডের সাথে অনেক পরে অলিম্পিক্সে মাথায় হেড গার্ডের ব্যবহারও লক্ষণীয়। ঊনবিংশ শতকের মধ্যকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বেশ কয়েকবার সর্বগ্রাহ্য নিয়মাবলীর প্রবর্তন এবং পরিবর্তন আধুনিক ক্রীড়া জগতে বক্সিং-এর স্থানকে এক অন্য মাত্রা প্রদান করে। অন্যান্য জনপ্রিয় ক্রীড়ার যে অন্ধকার দিক আছে বা ছিল, বক্সিং-এর আধুনিক ইতিহাসে সেই দিকগুলির কোনও অভাব নেই, বরং ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। গ্লাভস, মাউথ গার্ড, নতুন নিয়ম, চারকোণা রিং, রেফারি, জাজ, ঘণ্টার শব্দ, রিং-এ লড়াই কালে কিংবা চেঞ্জিং রুমে বিভিন্ন অন্যায় এবং দুর্নীতি এবং দর্শকদের উল্লাস কিংবা বিষাদের গমগমে শব্দ সহ এই নতুন মুষ্টিযুদ্ধ ঔপনিবেশিক ভারতে অনুপস্থিত ছিল না। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে মুষ্টিযুদ্ধ বা বক্সিং ভারতে প্রবেশ করে ঊনবিংশ শতকের শেষে।

১৮৩০ বা ১৮৪০-এর দশকে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের বিকাশকালে শিল্পাঞ্চল সংলগ্ন অঞ্চলে যে শ্রমিকদের বাসস্থান বা কোয়ার্টারগুলি গড়ে উঠেছিল, সেখানে অবসর সময়ে তাস-জুয়ার পাশাপাশি শ্রমিকরা খালি হাতে লড়াই করত — এগুলিতে সেরকম কোনও নিয়মের ব্যাপার ছিল না। ১৮৫০-এর দশকে গোটা পশ্চিম ইউরোপে সৈনিকদের ছাউনিতে এই একইরকম লড়াই [Brawling] হয়ে থাকত। কিছু নিয়মমাফিক লড়াই সেই সময়ের ব্রিটেনে, যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডায় এবং ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের পশ্চিমী দেশগুলিতে হত — এক্ষেত্রে কোনও কেন্দ্রীয় বা সর্বগ্রাহ্য নিয়ম ছিল না। আধুনিক বক্সিং-এর সর্বগ্রাহ্য নিয়মাবলীর জন্ম হয় ১৮৬৭ সালে মার্কেস অফ ক্যুইন্সবেরি রুলস-এর মাধ্যমে, যার প্রকৃত রচনা করেন জন গ্রাহাম চেম্বারস নামক জনৈক ওয়েলশ [Welsh] ক্রীড়াবিদ। ১৮৮৯ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা এই নিয়মাবলীর সরকারি মান্যতা দেয়। এই নিয়মে গ্লাভসের ব্যবহার আবশ্যক হয়। ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসেবে ভারতেও এই একই নিয়ম চালু হয়।

ভারতে, বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলায়, শারীরিক কৌশল এবং পেশীশক্তির চর্চা ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের আগে-পরে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে জাতীয়তা ভাবের উদয়কালে যুবসমাজের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণার সাথে এই চর্চা পুনরায় বাঙালি সমাজে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ঐ সময়ে বিভিন্ন সার্কাসের শো-তে নিয়মমাফিক বক্সিং-এর প্রদর্শনী হত। এই ঐতিহাসিক নজির ১৮৮৪ সালের একটি ঘন্টা। ঐ বছর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ-মধ্য কলকাতাতে জন উইলসনের 'গ্রেট ওয়ার্ল্ড সার্কাস'-এর মাঠ লোকজনের ভিড়ে উপচে পড়েছিল — সেখানে কলকাতার এক 'বাবু', জনৈক বাঙালি ভদ্রলোক পি. এন. মিত্র বক্সিং-এ উৎসাহী ব্রিটিশ সৈনিক ও অফিসারদের এক এক করে বক্সিং ম্যাচে আহ্বান করছিলেন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীদের শোচনীয় পরাজয়সহ ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন দর্শকবৃন্দের কাছে। এই ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিল তৎকালীন The Englishman নামক দৈনিক সংবাদ পত্রিকায়। ঐতিহাসিকদের মতে, ঐ দিনটি ছিল "Historically the First Day of Indian Boxing"। ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবসমাজে বক্সিং ভীষণই জনপ্রিয় ছিল। যে সমস্ত যুবাবৃন্দ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের নিয়মিত বক্সিংএর প্রশিক্ষণ দেওয়া হত (বিশেষত অনুশীলন সমিতি এবং যুগান্তর দলের ক্ষেত্রে)। জীবনতারা হালদার তাঁর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুশীলন সমিতির ভূমিকা বইতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, সমিতির সভ্যদের নিয়মিত বক্সিং অভ্যাস করতে হত এবং তিনি নগেন দত্ত ও সুরদাস নামক সমিতির দুই সদস্যের উল্লেখ করেছেন যাঁরা বক্সিং-এ অত্যন্ত সুনিপুণ ছিলেন।

বর্তমানে বিভিন্ন ক্রীড়ার ইতিহাস রচনাকালে ঐতিহাসিকরা লক্ষ্য করেছেন যে, ভারতের আধুনিক বক্সিং-এর ইতিহাসে স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তর যুগের বেশ অনেকটা সময়েই বিদেশি এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধাদের উপস্থিতি দেশীয় মুষ্টিযোদ্ধাদের তুলনায় বেশি। ১৮৯৮ সালে পৃথিবীর প্রথম লাইট ওয়েট চ্যাম্পিয়ন জ্যাক ম্যাকঅলিফ [Jack McAuliffe-আমেরিকান মুষ্টিযোদ্ধা) কলকাতার পার্কস্ট্রীটে ভারতের প্রথম বক্সিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৩ সালের তাঁর ক্লাবের দ্বারা আয়োজিত বক্সিং

প্রতিযোগিতায় দু'জন বাঙ্গালী মুষ্টিযোদ্ধা — এম. এন. মিত্র এবং এল. সি. সান্যাল Natives' Boxing Championship of Calcutta সেগমেন্টে অংশগ্রহণ করেন এবং এম. এন. মিত্র সেখানে বিজয়ী হন। আলবার্ট ই. ফ্লেমিং [Albert I. Fleming] কলকাতা এবং বোম্বেতে লন্ডনের ন্যাশনাল স্পোর্টিং ক্লাব-এর বক্সিং রুলস — মূলত প্যাডেড রিং, ওয়েট ক্যাটেগরি এবং ৬ আউন্সের গ্লাভসের ব্যবহার — প্রবর্তন করেন। ফ্লেমিং প্রথম All Allies Open Boxing Tournament শুরু করেন কলকাতা এবং বোম্বেতে — এটি ভারতবর্ষের প্রথম সংগঠিত নিয়মমাফিক বক্সিং টুর্নামেন্ট ছিল। ফ্লেমিং প্রথম বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের খেলার অংশ হিসেবে বক্সিং-এ প্রশিক্ষণের সূচনা করেন — প্রথমে বোম্বের বাইকুল্লা স্কুল ও ক্যাথেড্রাল হাইস্কুলে এবং পরে কলকাতার স্কুলগুলিতে।

বাংলা তথা ভারতের বক্সিং-এর ইতিহাস চর্চায় অগ্রগণ্য একটি নাম পরেশলাল রায়। তাঁকে বলা হয় Father of Indian Boxing। পরেশলাল জন্মগতভাবে কলকাতার এক জমিদারের পুত্র — শিক্ষালাভ লন্ডনের সেন্ট পলস স্কুলে এবং পরে কেমব্রিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে। ব্রিটেনের অল্ডারশটে আয়োজিত Public School Champioships-এ তিনি কেমব্রিজ-এর প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং অক্সফোর্ড-কে হারিয়ে ফেদার ওয়েট ক্যাটেগরিতে চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯১৪ সালে তিনি ইংল্যান্ডের ব্যান্টাম ওয়েট চ্যাম্পিয়ন হন। ঐ বছরই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে তিনি রয়্যাল ফ্লাইং কর্প্সে যোগদান করেন এবং সেখানে ব্রিগেড স্কোয়াড্রন চ্যাম্পিয়নশিপে জয়লাভ করেন। ১৯১৯ সালে ভারতে প্রত্যাগমন করে তিনি বালিগঞ্জে (স্ট্যান্ড রোডে) একটি বক্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৮ সালে তাঁর উদ্যোগে প্রথম All-Indian Railway Boxing Championship এবং Inter-Railway Boxing Championship-এর সূচনা হয়। পরেশলাল পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন না — কিন্তু তিনি ১৯২৪ সালে কলকাতার গ্র্যান্ড অপেরা হাউসে ভারতের তৎকালীন ফ্লাই ওয়েট এবং ব্যান্টাম ওয়েট চ্যাম্পিয়ন এডগার ব্রাইট-কে [Edgar Bright] এবং পরে ফিলিপিন মুষ্টিযোদ্ধা ইয়ং টারলে-কে [Young Tarle] পরাজিত করেন। তাঁর কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্র হলেন — সন্তোস দে, প্রমথ চৌধুরী, ফণি মিত্র, জে. কে. শীল, বি. ডি. চ্যাটার্জী, নগেন চ্যাটার্জী, কৃষ্ণমোহন দাশ এবং বিনয় ব্যানার্জী। ১৯৩০ সালে পরেশলাল প্রতিষ্ঠা করেন Bengal Amateur Boxing Federation (BABF) Limited। তাঁর ছাত্র সন্তোষ দে ১৯৪১ সালে Bengalee Boxing Association প্রতিষ্ঠা করেন। এরই সাথে সন্তোষ দে আরও ৩৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন, যেগুলি থেকে বাছাই করা সেরা বাঙ্গালী মুষ্টিযোদ্ধাদের একটি দল ১৯৪৪ সালে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের মুষ্টিযোদ্ধাদের হারিয়ে উইনগেট কাপ জয় করে এবং কয়েক বছর বাদে ইউ. এস. আর্মির একটি দলকে হারিয়ে আর্মি ইনভাইটেশনাল কাপ জয় করে। বাঙ্গালী সমাজে বক্সিং-এ অংশগ্রহণ করার প্রতি এই উদ্দীপনা দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণে বেশ ক্ষীণ হয়ে যায় পরবর্তী দশকগুলিতে। বিংশ শতকের শেষে এবং একবিংশ শতকের শুরুতে বাংলার মুষ্টিযোদ্ধা মহম্মদ আলি কামার ২০০২ সালে ম্যানচেস্টারে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম ভারতীয় হিসেবে স্বর্ণপদক জিতে পুনরায় বাংলা এবং বক্সিং-এর সংযোগ স্থাপন করেন।

ভারতীয় বক্সিং-এর ইতিহাসে শুধু বাংলা বা বোম্বে নয়, দক্ষিণ ভারতও এক অন্যরকম চিত্র তুলে ধরে। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শুরু করে একজোড়া বিশ্বযুদ্ধের যে রমরমা, তার এক অনিবার্য উপসংহার ছিল ভারতের বিভিন্ন সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নতুন নতুন ক্যান্টনমেন্ট শহরের আবির্ভাব। এই ধরনের শহরগুলিতে Professional এবং Amateur বক্সিং ম্যাচ লেগেই থাকত — মূল কারণ শাসক শ্রেণির বিনোদন। এক্ষেত্রে আদর্শ একটি উদাহরণ ১৯২০ বা ১৯৩০-এর ব্যাঙ্গালোর শহর। তখনও ব্যাঙ্গালোর আজকের Silicon Valley of India হয়ে ওঠেনি। — সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ঔপনিবেশিক ক্যান্টনমেন্ট শহর ছিল ব্যাঙ্গালোর সেই সময়ে। ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে ব্যাঙ্গালোরের বক্সিংপ্রেমী দর্শকবৃন্দ এবং স্থানীয় সংবাদ পত্রিকায় একটি আলোচ্য নাম ছিল Gunboat Jack বা GBJ। জাতিতে আফ্রিকান-আমেরিকান এই Gentleman Boxer-এর প্রকৃত নাম ছিল জেমস উইলসন কলজি [James Wilson Colzie]। ঠিক কবে এবং কিভাবে এই মার্কিন নাবিক ব্যাঙ্গালোর-এ আবির্ভূত হলেন, সেই নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। সমকালীন প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁকে Gentleman বলত, কারণ তিনি তাঁর দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি এবং মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সহানুভূতিশীল ছিলেন। এর প্রমাণ স্বরূপ দুটি ঘটনা জানা যায়। ১৯৩৬ সালে জবলপুরে লেন ব্যারো [Len Barrow]-এর সাথে লড়াইয়ের সময়ে গানবোট জ্যাকের হুকো ব্যারো ভীষণ ভাবে আহত হয়ে নকআউট হন এবং হাসপাতালে ভর্তি হন — ঐ চোট থেকে ব্যারো-র মৃত্যু হওয়ার আগে গানবোট জ্যাক ক্ষমাপ্রার্থী হিসেবে বেশ কয়েকবার হাসপাতালে সাক্ষাৎ করতে যান। আরেকবার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মহিলা সমাজকর্মী ইউনফ্রেড জোসেফ [Winfred Joseph] রাত্রে যখন একা ব্যাঙ্গালোরের বাড়ির দিকে হেঁটে ফিরছিলেন, কয়েকটি ব্রিটিশ সৈন্য তাঁকে ঘিরে ধরে কটূক্তি শুরু করে। ঘটনাক্রমে গানবোট জ্যাক সেই সময়ে একই স্থানে হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং ঐ কটূক্তি তিনি দূর থেকে শুনতে পান। তৎক্ষণাৎ তিনি ঐ সৈন্যদের দিকে তেড়ে যান এবং যেহেতু তারা তাঁকে চিনত এবং ভয় ও সমীহ করত, তারা উইনফ্রেডকে ছেড়ে দিয়ে পলায়ন করে।

ওয়েল্টার ওয়েট, মিডল ওয়েট এবং লাইট হেভিওয়েট — এই তিনটি ক্ষেত্রেই গানবোট জ্যাক অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত লড়াই ছিল আমেরিকার গোল্ডেন গ্লাভ চ্যাম্পিয়ন আর্থার ডিমলার-এর [Arthur Dimler] বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ লাইট ওয়েট চ্যাম্পিয়ন নোবি হল-এর [Nobby Hall] বিরুদ্ধে, রেঙ্গুনে বর্মার চ্যাম্পিয়ন ইয়ং ফ্রিস্কোর [Young Frisko] বিরুদ্ধে, বোম্বাই-এর ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে ব্রিটিশ ভারতের ওয়েল্টার ওয়েট চ্যাম্পিয়ন ফ্র্যাঙ্ক ম্যালিনাও-এর [Frank Malinao] বিরুদ্ধে এবং জব্বলপুরে লেন ব্যারো-এর বিরুদ্ধে — প্রতিটিতেই তিনি নকআউট-এর মাধ্যমে জেতেন এবং শেষেরটিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু হয়।

ভারতীয় বক্সিং-এর ইতিহাস আলোচনাকালে খ্রিষ্টান মিশনারিদের অবদান অনস্বীকার্য। ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে শুরু করে বেশ কয়েক দশক পর্যন্ত মুষ্টিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ এবং ম্যাচ সংগঠনকে কেন্দ্র করে নতুন এক ক্রীড়া-সংস্কৃতির উদ্ভবে বিভিন্ন মিশনারি প্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন কোণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় চরিত্র শঙ্কর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে

YMCA [Yong Men's Christian Association] বক্সিং ক্লাবের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। ভারতের দুর্গম অঞ্চলগুলিতে, বিশেষ উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে (যেমন উত্তরপূর্ব ভারত কিংবা দক্ষিণ ভারতে) বক্সিং-এর প্রচলন খ্রিষ্টান মিশনারিদের কৃতিত্ব।

ভারতীয় বক্সিং-এর ইতিহাসে দেশীয় মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। India's Fistic Pride নামে পরিচিত অ্যারন যোশুয়া-এর [Aaron Joshua] পৃষ্ঠপোষকতা করতেন কুচবিহারের মহারাজা। আরও দুই বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা — বেবি অ্যারন [Baby Aaron-ইহুদি] এবং রবিন ভট্ট — কুচবিহারের রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। শেষোক্ত এই দুই মুষ্টিযোদ্ধা ১৯৪৮ সালে লন্ডন অলিম্পিক্সে ভারতের প্রতিনিধিত্বও করেন।

ভারতীয় বক্সিং-এর ইতিহাসে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ১৯৯০-এর দশকের আগে তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে উত্তর মাদ্রাজে স্থানীয় পেশাদার বক্সিং বা সরপাট্টা পরম্বরাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ঠিক কখন এবং কবে বক্সিং-এর এই সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছিল, তা জানা যায় না; তবে, মাদ্রাজের আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সংস্কৃতির বড় ভূমিকা ছিল। কিন্তু মাদ্রাজ এবং দক্ষিণ ভারতের বাইরে এই সংস্কৃতির প্রভাব খুব একটা জানা যায় না। সাম্প্রতিককালের এক দক্ষিণী চলচ্চিত্রে [Sarpatta Parambarai, 201] এই সংস্কৃতির কিছু দিক দেখা গিয়েছে।

১৯৯০-এর দশক থেকে ভারত বক্সিং জগতে এক এক করে বহু প্রতিভার জন্ম দেয়। শুধু হরিয়ানার ভিওয়ানি বক্সিং ক্লাব থেকেই বহু প্রতিভা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক জিতেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ২০০৮ অলিম্পিক্সে ৭৫ কিলো ক্যাটেগরিতে ব্রোঞ্জ পদকপ্রাপ্ত বিজেন্দ্র সিং, কোয়ার্টার ফাইনাল অব্দি পৌঁছনো ৫১ কিলো ক্যাটেগরিতে জিতেন্দ্র কুমার এবং ৫৪ কিলো ক্যাটেগরিতে অখিল কুমার এবং কবিতা চহাল — যিনি ৬ষ্ঠ এবং ৭ম World Women's Boxing Championship-এ ব্রোঞ্জ পদক জিতে নেন। বর্তমানে মহিলা বক্সিং-এ অনেকগুলি ভারতীয় নাম উঠে এসেছে। মেরি কম ৬টি AIBA Women's World Championships-এ স্বর্ণ পদক জিতে নেন (২০০২, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৮)। ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিক্সে মেরি কম ব্রোঞ্জ পদক জেতেন। আসামের মেয়ে লভলিনা বোর্গোহাইন ২০১৮ এবং ২০১৯-এ AIBA Women's World Championships-এ ব্রোঞ্জ পদক, ২০২০ টোকিও অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ পদক এবং ২০২৩-এ IBA Women's World Championships-এ স্বর্ণ পদক জেতেন। ২০২২ সালে কমনওয়েলথ গেমস এবং IBA Wome's World Championships-এ নিখাত জারিন স্বর্ণ পদক জেতেন।

ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য, সামাজিক সমস্যা, দুর্নীতি, রাজনীতি এবং আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বেড়াজালে বক্সিং এবং এরকম আরও অনেক ক্রীড়ার সার্বিক বিকাশ আটকে রয়েছে। ১৯৯০-এর পর থেকে বক্সিং-এ ভারতের যে সাফল্য — তা চমকপ্রদ হলেও বৃহৎ নয়। ভারতীয় পুরুষ এবং মহিলা মুষ্টিযোদ্ধাদের সামর্থ্য আরও বেশি — শর্ত শুধু একটাই — সরকার এবং সাধারণ মানুষের তরফ থেকে নিঃ

শর্ত সহায়তা এবং সমর্থন। যেহেতু বক্সিং আদতে একটি Spectator Sports, মিক্সড মার্শাল আর্টস কিংবা কিক বক্সিং জাতীয় আরও কয়েকটি ক্রীড়ার মত বিভিন্ন Professional টুর্নামেন্ট (অনেকটা যেরকম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে হয়ে থাকত এবং এখনও হয়, যেমন UFC) আয়োজন করলে মুষ্টিযোদ্ধাদের অনেক রকম আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তিলাভ হয় — ফলত তাঁরা বক্সিং-এর প্রশিক্ষণ এবং সংগঠন-এর প্রতি আরও মনোনিবেশ করতে পারেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতবর্ষে বক্সিং-এর মহিমান্বিত ঐতিহ্য দেখে এই আশা রাখা যায় যে ভবিষ্যতে ভারত বক্সিং-এ আরও সাফল্য লাভ করবে।

তথ্যসূত্র ঃ—

১) Dasgupta, Shamya. "An inheritance from the British' " The Indian boxing story". The International Journal of the History of Sport Vol. 21, Issue 3-4, 2004, 431-451.
[http://dx.doi.org/10.1080/09523360409510549]

২) https://thepaperclip.in/gunboat-jack/

৩) https://boxrec.com/wiki/index.php/Gunboat Jack

৪) https://bangaloremirror.indiatimes.com/bangalore/cover-story/the-glovestory/articleshow/21471825.cms

---

"বড়লোকের বাড়ীর ঝি-চাকর কাজ করবার সময় ভাবে সবই মনিবের কাজ, নিজের কিছুই নয়। তেমনি সংসারে থেকে কাজ করতে করতে মনে করবে সবই তাঁর কাজ, নিজের বলতে কিছুই নয়।"

— শ্রীরামকৃষ্ণ

সেকালের বাংলার ফুটবলের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

অরিন্দম বিশ্বাস (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

"সব খেলার সেরা বাঙালির সেরা
তুমি ফুটবল।"

বিখ্যাত সংগীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ, গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কিংবদন্তি গায়ক মান্না দে-র এই আইকনিক গানটির সাথে হয়ত বা এই প্রজন্মের বাঙালিরা সহমত পোষণ নাও করতে পারে। কিন্তু তাদের এই চিন্তা যে কত বড় ভ্রম তা বাংলার ও বাঙালির ইতিহাস ঘাঁটলেই পাওয়া যাবে। বাঙলার ইতিহাস বলতে শুধু স্বাধীনতা আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কিম্বা নকশাল আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা পালন করছে ফুটবল। বাঙালির এই ঐতিহ্যবাহী ইতিহাসে মূল ভূমিকা পালন করছে আবেগপ্রবণ সমর্থক, কিছু মহান ক্লাব ও উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ফুটবল বাঙালির ধর্ম ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল এবং এখনও সেই ধারা বহন করে চলেছে। সময় বিংশ শতাব্দী, ময়দান। গড়ের মাঠ, দুর্গ ও নগর-এর মধ্যবর্তী সমতল মাঠ। উত্তরে এসপ্ল্যানেড ইস্ট, দক্ষিণে এ. জে. সি. বোস রোড, পুবে চৌরঙ্গী, পশ্চিমে গঙ্গা। পরিখা দিয়ে ঘেরা অঞ্চল। কলকাতার ফুসফুস। কাদাজল মাখা ফুটবল। জোনাকির মতো জ্বলে থাকা ক্লাবগুলো। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান-মহামেডানের তাঁবুর বাইরে ভিড়, খেলার দিন। টিকিটের দাম ছিল ৬০ পয়সা (মাঠের লম্বালম্বি) আর ১ টাকা ১০ পয়সা (আড়াআড়ি)। কাঠের গ্যালারি, টিকিট ফুরিয়ে গেলে বা লাইনে মারপিট। মোহনবাগান মাঠের খোলা অঞ্চলের দিকে পজিশন নিতে পারলে কষ্ট করেও কিছুটা দেখা যেত। ও-দিকটায় আবার পেরিস্কোপ ভাড়া পাওয়া যেত, পাঁচ মিনিটের হিসেবে। ম্যাচ শুরু হলে সেই পেরিস্কোপে চোখ রাখছে বাঙালি। আর আমরা টাইমস্কোপে চোখ রেখে ঘুরে আসি বাংলার ফুটবলের আদি লগ্নে।

ব্রিটিশরা যখন পরাধীন ভারতে ফুটবল নিয়ে আসে তখন এই খেলাটিকে সবার আগে রপ্ত করে নিয়ে আঁকড়ে ধরে বাঙালিরা। ঔপনিবেশিক আমল থেকেই বাংলা ছিল ভারতীয় ফুটবলের প্রধান কেন্দ্র। বাংলার প্রথম সংগঠিত ফুটবল ম্যাচটি হয়েছিল ১৮৫৮ সালে কলকাতা ক্লাব বনাম শোভাবাজার সদস্যদের মধ্যে, এরপর খেলার জনপ্রিয়তা বাড়ার সাথে সাথে উৎসাহী বাঙালিরা ক্লাব গঠন করা শুরু করে। এরপর একে একে জন্ম নেয় শোভাবাজার ক্লাব (১৮৮৫), ওয়েলিংটন ক্লাব (১৮৮৪), টাউন ক্লাব (১৮৮৫), কুমোরটুলি (১৮৮৫) মোহনবাগান (১৮৮৯), এরিয়ান্স (১৮৮৯), মহামেডান স্পোর্টিং (১৮৯১), স্পোর্টিং ইউনিয়ন (১৮৯৫), ইস্টবেঙ্গল (১৯২০)। বাংলা ছিল তৎকালীন সময়ের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল, তাই ব্রিটিশ শাসকদের চিন্তায় ছিল ফুটবল নামক নেশায় বাঙালিদের বুঁদ করে রেখে স্বাধীনতার আন্দোলনকে স্তিমিত করে রাখা। কিন্তু তাদের এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয় কিছুদিনের মধ্যেই। ১৯১১ সাল ২৯শে জুলাই বাংলার

ফুটবল ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য দিন। কারণ এই দিনেই ব্রিটিশ ক্লাব ইস্ট ইয়র্ক রেজিমেন্টকে হারিয়ে প্রথম কোন ভারতীয় ক্লাব হিসেবে মোহনবাগান আই.এফ.এ. শিল্ড জয় লাভ করে, যা পরবর্তীতে স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদের হাতিয়ার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ও খেলার মাঠে জাতীয়তাবাদ-এর প্রতীক হিসাবে বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষকে উদ্দীপ্ত করে। এর পর একে একে মহামেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের উত্থানের মূলত তিন প্রধানকে কেন্দ্র করে বাঙালির চর্চা ও সংস্কৃতি আবর্তিত হয়েছিল। পরাধীন ভারতে মোহনবাগানের সঙ্গে যেমন মিশে ছিল জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা, মহামেডানের সঙ্গে তেমনই জড়িয়ে ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের আবেগ। আর মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলকে কেন্দ্র করে পশ্চিম বাংলার বাসিন্দা ঘটি ও পূর্ব বাংলা হতে আগত বাঙালদের মধ্যে তো ক্রমে এক চিরন্তন সমান-সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব বিকাশ লাভ করেছিল। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-এর এই দ্বৈরথ বিশ্বের চিরকালীন ক্লাবদ্বন্দ্বগুলির মধ্যে অন্যতম। যা 'কলকাতা ডার্বি' নামে পরিচিত। ১৯২১ সালের ৮ই আগস্ট যার সূত্রপাত। যা বাংলার ফুটবল ইতিহাসের এক বহুমূল্য সম্পদ ও হাজারো ভক্তদের আবেগের সংমিশ্রণ।

বাংলা অসংখ্য ফুটবল কিংবদন্তি উপহার দিয়েছে, যাঁরা তাদের অসাধারণ দক্ষতায় ইতিহাসের পাতায় তাঁদের ছাপ রেখে গেছেন। ব্যক্তিনাম হিসেবে বাঙালির ফুটবলের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য নগেন্দ্রপ্রসাদ, কালীচরণ মিত্র, হরিদাস শীল, মন্মথ গাঙ্গুলি এবং নরেন্দ্রনাথ দত্ত। এছাড়াও প্রখ্যাত বাঙালি ফুটবলার হিসেবে গোষ্ঠ পাল, চুনী গোস্বামী, পিকে ব্যানার্জি, তুলসীদাস বলরাম, শৈলেন মান্না প্রমুখ অন্যতম কয়েকটি নাম, তাঁরা তাঁদের ব্যতিক্রমী দক্ষতা এবং নেতৃত্ব হাতিয়ার করে শুধুমাত্র বাংলার ফুটবল নয় ভারতীয় ফুটবলেও তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেছেন।

এছাড়াও আরও অনেক উল্লেখ্যযোগ্য ব্যক্তিত্ব-এর মধ্যেও দুটি নাম জ্যোতিষ গুহ আর ধীরেন দে। জ্যোতিষ গুহ ১৯৩০ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে কিছুদিন খেলেছিলেন, ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে উত্তপ্ত আবহাওয়ার মাঝেই জ্যোতিষ গুহ পাড়ি জমান বিলেতে। গুহ পরিবারের জ্যোতিষ বিলেতে গিয়েছিলেন মূলত ব্যারিস্টারি পড়তে, কিন্তু ঐ যে ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। জ্যোতিষ গুহর ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হল না। ইস্টবেঙ্গালে ততদিনে কিছুটা হত্তাকর্তা হয়ে যাওয়া জোতিষ গুহ ইউরোপে সান্নিধ্য পেলেন বিখ্যাত ব্রিটিশ ক্লাব আর্সেনালের, সেখানে খেলার পাশাপাশি খেলা পরিচালনার কাজটাও মন দিয়ে শিখে দেশে ফিরে এলেন তিনি। কলকাতায় ফিরেই ধরলেন ইস্টবেঙ্গালের হাল, স্বাধীনতার আগে আগে ইস্টবেঙ্গালের সমর্থক ক্রমশ বাড়ছে এ দেশে, জ্যোতিষ গুহর হাত ধরেই দলে আসতে শুরু করলেন একের পর এক তারকা। বাংলা ফুটবলের সম্ভবত প্রথম বিদেশি ফ্রেড পাগস্লে ছিলেন বার্মিজ রিফিউজি, তাঁকে দলে নিয়ে জ্যোতিষ গুহ প্রথম সাড়া ফেলে দেন। অন্যদিকে ধীরেন দে-ও ছিলেন এক বর্ণময় চরিত্র। একদিকে যেমন তিনি কলকাতার বিখ্যাত দে'জ মেডিকেলের মালিক, তেমনি পাশ করা রেফারিও বটে। মোহনবাগানের ইতিহাসে ধীরেন দে-র মতো চরিত্র আর নেই। জ্যোতিষ গুহ যেমন নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গালের জন্য, ধীরেন দে তেমনি সর্বস্ব দিয়ে আগলে রাখতেন মোহনবাগানকে। নিজের পকেট থেকে টাকা বের করে মোহনবাগান তাঁবুতে বিলিয়ে দিতেন দুঃস্থ খেলোয়াড়দের মধ্যে। পঞ্চাশের দশকে বদ্রু ব্যানার্জি-চুনী-সাত্তারের মতো

তারকাদের গডফাদার হয়ে উঠেছিলেন ধীরেন দে, স্যুটেড বুটেড ধীরেন ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের বন্ধু। কলকাতার উচ্চবিত্ত ও ক্ষমতাশীল সমাজে আনাগোনা সত্ত্বেও ময়দানি আবেগে ধীরেন দে ছিলেন সবার ওপরে। একদিকে জ্যোতিষ গুহ যখন মোহনবাগানের দিকে অভিযোগের তির ছুঁড়তেন কোনো ম্যাচকে ঘিরে, সঙ্গে সঙ্গে রেগে আগুন ধীরেন বাবু। অথচ এই দুই কর্তার বন্ধুত্বের গল্পটিও চোখে পড়ত সমান ভাবে।

কিন্তু বাংলার ফুটবল সংস্কৃতি মানে কি শুধু এইটুকুই! বাঙালির কাছে ফুটবল মানে যেমন ঘটি-বাঙাল, নৌকা-মশাল কিংবা চিংড়ি-ইলিশ, তেমনই ফুটবল মানে ময়দানের ঘেরা মাঠ থেকে পাড়ার ঠেকের আড্ডায় তর্ক-বিতর্ক-মারামারি, দলবদল নিয়ে তিন প্রধানের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই আর মাস্‌লম্যানদের শক্তি প্রদর্শন, রৌদ্র-জল-কাদা ডিঙিয়ে আর মাউন্টেড পুলিশের গুঁতো আর লাঠি খেয়ে খেলা দেখা, জামা, জুতো, ছাতা, কাগজ, পতাকা, প্ল্যাকার্ড, মোবাইল নিয়ে উচ্ছাসের লোফালুফি থেকে তীব্র চিৎকারে আর মেঠো গালাগালিতে গ্যালারি মাতিয়ে তোলা, মাঠে ইঁট বৃষ্টি ও রেফারি নিগ্রহ থেকে শহরের রাস্তায় বাস-ট্রাম ভাঙচুর, ফুটবল দর্শক-ভক্তদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে মেঠো উত্তেজনা-দাঙ্গা-হাঙ্গামা-ক্লাব তাঁবু আক্রমণ, এমনকী প্রিয় দলের পরাজয়ে আত্মহত্যা। মনে করুন, ১৯৭৫ সালের শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে পাঁচ গোলে হারার পর মোহনবাগান ভক্ত উমাকান্ত পালোধির সুইসাইড নোট ঃ 'সামনের জন্মে মোহনবাগানের ভালো ফুটবলার হয়ে এই পরাজয়ের শোধ নিতে চাই' বা সত্তর দশক জুড়ে কলকাতার ফুটবলে ক্রমবর্ধিত ময়দানি উত্তেজনা ও দর্শক-হাঙ্গামার প্রেক্ষিতে ১৯৮০-র ১৬ আগস্ট ইডেন উদ্যানে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে ষোলো জন দর্শকের মৃত্যু ফুটবলপ্রেমী বাঙালির জীবনে এক কালো ছায়া ফেলেছিল। যা বাঙালির ফুটবল সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ ও অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে।

বাঙালির ফুটবলচর্চা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হল ফুটবলের রেডিয়ো ধারাবিবরণী, টেলিভিশন সম্প্রচার, সাংবাদিক, ম্যাগাজিন, জনপ্রিয় ইতিহাস ও সাহিত্য, এমনকী ফুটবল নিয়ে গান-নাটক-চলচ্চিত্র। পুষ্পেন সরকার, অজয় বসু, কমল ভট্টাচার্য, সুকুমার সমাজপতি, জয়ন্ত চক্রবর্তীদের ধারাভাষ্য এক সময় বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ ছিল। টেলিভিশন আসার পর আশির দশক থেকে কিন্তু কোনও সময়েই লিগ শিল্প-সহ অন্যান্য প্রতিযোগিতা এমনকি জাতীয় লিগও ধারাবাহিক ভাবে বাঙালির বসার ঘরে হাজির হয়নি। ক্রিকেট এই সময় থেকেই সম্প্রচার, বাণিজ্য ও মিডিয়ার মধ্যমণি হয়ে উঠতে থাকে। ফলে বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবল ছোটো পর্দায় কিছুটা উপেক্ষিতই থেকে যায়, যে ট্র্যাডিশন আজও চলেছে। একই ভাবে সংবাদপত্র-পত্রিকায় ফুটবলের যে কেন্দ্রীয় ও ধারাবাহিক অবস্থান ছিল, তাও আজ আর নেই।

একই কথা প্রযোজ্য ফুটবল নিয়ে জনপ্রিয় রচনা, ইতিহাস বা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। এ ধরনের লেখনির এক দিকে রয়েছে সাংবাদিক, ভাষ্যকার, ফুটবলারদের লেখা বাংলা তথা ভারতে, কখনও বা বিশ্বে খেলাটির বিবর্তন, নায়কদের গাথা, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-এর মতো বিখ্যাত ক্লাবের ইতিহাস, আর কিছু বিখ্যাত ফুটবলারের আত্মজীবনী বা জীবনী।

আর অন্য দিকে সাহিত্যিকদের কলমে মতি নন্দীর 'স্টপার' বা 'স্টাইকার'-এর মতো অমর উপন্যাস

বা গল্প। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই দু'ধারার রচনাতেই ফুটবল ক্রমশ হারিয়ে যেতে শুরু করে নব্বইয়ের দশক থেকে। ক্রমে ক্রিকেট ও সৌরভ-সচিন সেই স্থান যেন দখল করে নেয়। বাঙালির গান, নাটক, চলচ্চিত্রে ফুটবল ব্যাপক ভাবে স্থান না পেলেও গত শতকে বাঙালির বেশ কিছু প্রয়াস চিরন্তন আবেদন রেখেছিল। 'সপ্তপদী', 'স্ট্রাইকার', 'ধন্যি মেয়ে', মোহনবাগানের মেয়ে', 'সাহেব', 'ইস্টবেঙ্গালের ছেলে' কিংবা 'আশ্রয়' বাংলা চলচ্চিত্রে ফুটবলের ঐতিহ্যকে বহন করেছিল। নান্দীকারের বিখ্যাত নাটক 'ফুটবল' আজও বাঙালিকে নস্টালজিক করে তোলে। একই ভাবে মান্না দে-র গাওয়া 'সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল' বা 'খেলা ফুটবল খেলা' আজও বাঙালির হৃদয় স্পর্শ করে যায়। কিন্তু ফুটবলের এই আপাত সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণ নব্বইয়ের দশক থেকে ক্রমশ অদৃশ্য হতে শুরু করে। আর সে জন্যেই বোধ হয় ১৯১১-র শিল্ড জয়ের শতবর্ষে নির্মিত 'এগারো' বাঙালি দর্শককে সে ভাবে সিনেমা হলে টানতে পারেনি। নতুন শতকে তাই ইন্টারনেট আর সোশ্যাল মিডিয়ার উদ্ভাবনী যুগে বসেও অতীত ঐতিহ্য হাতড়েই যেন আমাদের ফুটবল সংস্কৃতির গৌরব অন্বেষণ করতে হচ্ছে। তাই এ কথা বলা যায়, যেখানে বিশ শতক জুড়ে বাঙালির চিন্তায়, মননে, স্মরণে ফুটবলের গভীর উপস্থিতি, নতুন শতকে কোথাও যেন বাঙালি সংস্কৃতিতে ফুটবলের স্থানচ্যুতি ঘটেছে। বর্তমানে বাঙালি তথা ভারতীয় ফুটবল সংস্কৃতির লড়াই আর শুধু ক্রিকেটের সঙ্গে নয়। ব্যাডমিন্টন, শুটিং, টেনিস, কুস্তি, বক্সিংয়ের মতো অলিম্পিক খেলাগুলোর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা আইকনপ্রিয় বাঙালিকে আকর্ষণ করতে শুরু করেছে। বাংলার ফুটবল জন্মলগ্ন থেকে প্রতিকূলতাতে ভরা। কখনও খেলাটি জনপ্রিয়তার ওঠানামা, ক্লাবগুলির জন্য আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং পরিকাঠামো সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। যাইহোক, ফুটবল সম্প্রদায়ের স্থিতিস্থাপকতা এবং ভক্তদের অটল সমর্থন এই চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। তাই আমার মত ফুটবলপ্রেমীদের বিশ্বাস একদিন না একদিন আমরা একজোট হয়ে বাঙালির ফুটবলের সেই লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি আবার ঠিক জাগিয়ে তুলবো।

বাংলার ফুটবল ইতিহাস বিজয়, প্রতিকূলতা এবং খেলার অবিরাম চেতনায় বিশাল একটা ট্যাপেস্ট্রি। ঔপনিবেশিক প্রভাবের প্রথম দিন থেকে পেশাদার লীগের আধুনিক যুগ পর্যন্ত, বাঙালির পরিচয় গঠনে ফুটবল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আইকনিক ক্লাব, কিংবদন্তি খেলোয়াড় উৎসাহী আবেগপ্রবণ ভক্তদের পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে। ফুটবলের সাথে বাংলার ও বাঙালির ভালোবাসার সম্পর্ক একটি স্থায়ী গল্প হিসাবে রয়ে গেছে আজও। তাই বলা যেতেই পারে —

"রকে রকে ঝগড়া, ঘরে ঘরে ডাইভোর্স
ইলিশে ঘটিতে রসাতল,
সব খেলার বাঙালির তুমি ফুটবল...."

তথ্যসূত্র ঃ—

১) বাংলার ফুটবলের ইতিহাস — Wikipedia,

২) সবার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল — cisammav.com

৩) ফুটবল খেলায় বাঙালির অংশগ্রহণ ও সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ — millioncontent.com

মহাকাশ গবেষণায় ভারত

শুভঙ্কর সাহা (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

বর্তমান যুগে মহাকাশ গবেষণার যে গতিময়তা তার সাথে আমাদের ভারত সক্রিয়ভাবে জড়িত। ভারতে মহাকাশ অনুসন্ধানের ইতিহাস নতুন নয়, বরং এর একটি নিরবচ্ছিন্ন উৎস রয়েছে। গ্রিক ও ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যাচর্চাকে মূল ভিত্তি হিসেবে ধরে প্রাচীনকাল থেকেই মহাকাশ গবেষণা প্রচলিত। এই মহাকাশ চর্চায় যাদের নাম আমরা সবচেয়ে বেশী অনুধাবন করি তারা হলেন আর্যভট্ট ও বরাহমিহির। আর্যভট্ট প্রথম পৃথিবীর আকার যে গোলাকার তার সুস্পষ্ট ধারণা দেন। তিনি নিখুত ভাবে পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধি সংজ্ঞায়িত করেন এবং চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সঠিক ব্যাখ্যা দেন।

আধুনিক ভারতের মহাকাশ চর্চা ঃ—

ভারতবর্ষে বিদেশি শাসকদের রাজত্বের সময় মহাকাশ চর্চা স্তিমিত হলেও ব্রিটিশ শাসনের অবসানে পুনরায় ভারত মহাকাশ চর্চায় জোর দেয়। ১৯৬১ সালে থুম্বা মহাকাশ কেন্দ্র থেকে প্রথম রকেট উৎক্ষেপন ঘটে। ১৯৬৯ সালে ডঃ বিক্রম সারাভাই-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারত সরকারের সহায়তায় ইসরো প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরপর থেকে ইসরো নিজের উদ্যোগকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন দেশের সহযোগিতায় মহাকাশ গবেষণায় উন্নতি লাভ করে। মহাকাশ গবেষণায় ভারতের সাফল্যে যাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে তিনি হলেন মিসাইল ম্যান নামে পরিচিত **"ডঃ এ পি জে আব্দুল কালাম"**। তাঁর বহুদিনের প্রচেষ্টায় ভর করে ভারতের মহাকাশযান গুলি প্রথম পাড়ি জমায় মহাকাশে। তবে ইসরোর উন্নতিতে যে ব্যক্তির নাম উঠে আসে তিনি হলেন সতীশ ধাওয়ান। ১৯৭৬ সালে ইসরোর প্রচেষ্টায় প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্ট মহাকাশগামী হয়। এমন সব প্রবাদপ্রতিম ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় মহাকাশ অভিযানের সংখ্যা ১১১। তবে পরবর্তীকালে সব মহাকাশ অভিযান কিছুটা সফল বা আংশিক সফল। ১৯৭৫ সালে ইসরোর প্রচেষ্টায় প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্ট মহাকাশগামী হয়। এর চার বছর পর ১৯৭৯ সালে ৭ই জুন পরবর্তী মহাকাশ যাত্রার নাম ভাস্কর-১। ১৯৮০ সালে রোহিনী কে মহাকাশ অভিমুখে পাঠানো হয়। ২০১৪ সালে প্রথমবারের চেষ্টায় মঙ্গালে মহাকাশযান অবতরণ করে ইসরো। এর আগে কোনো দেশ প্রথমবারের চেষ্টায় মঙ্গাল অভিযান করতে পারেনি এবং সবচেয়ে আশ্চর্য এর ব্যাপার হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দশগুণ কম খরচে মাত্র ৪৫০ কোটি টাকায় ইসরো মঙ্গাল অভিযান করেছে। ২০০৮ সালে চন্দ্রের কক্ষপথে মহাকাশযান পাঠায় ভারত। এর পরবর্তী বছর গুলিতে অধিকাংশ উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়েছে। সেগুলি হল — রোহিনী-১, ভাস্কর-১, ইনস্যাট-১, ইনস্যাট-২।

ভারতে প্রথম চন্দ্র অভিযান ঃ—

ভারতের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে তিনটি চন্দ্র অভিযান গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটি হল চন্দ্রযান-১, চন্দ্রযান-২, চন্দ্রযান-৩।

চন্দ্রযান-১

অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ২০০৮ সালে ২২ অক্টোবর ভারতীয় সময় সকাল ৬টা ২৫ মিনিটে পিএসএলভি ১১ রকেটের সহায়তায় চন্দ্রযান-১ মহাকাশ যানকে চাঁদের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। ২০০৮ সালের ১২ নভেম্বর এটি চাঁদের পাশে ১০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের কক্ষপথে পরিক্রমণ করতে শুরু করে। চন্দ্রযান-১ মোট এগারোটি যন্ত্র নিয়ে পাড়ি দিয়েছিল চাঁদের পথে। তার মধ্যে চারটি যন্ত্র ও সংঘাতকারী প্রোবটা ছিল ভারতের নিজস্ব এবং বাকি ছটা যন্ত্র ছিল নাসা, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি এবং বুলগেরিয়ান অ্যাকাডেমিক অফ সায়েন্স এর তৈরি। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল চাঁদের রাসায়নিক ও খনিজ সম্পর্কে গবেষণা করা। চন্দ্রযান-১ এমআইপি সহ আরো উন্নত মানের যন্ত্রপাতি বহন করেছিল। এই চন্দ্রযান-১ প্রথম জলের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিল। এর পরবর্তী চন্দ্র অভিযানটি হল —

চন্দ্রযান-২

এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৯ সালে এটি অবতরণ করা হয়েছিল জিএসএলভি রকেটের মাধ্যমে যার খরচ ৩৭৮ কোটি টাকা। এই চন্দ্রযান-২ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করে যা আমাদের সবসময় দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। চন্দ্রযান-২ উপগ্রহ তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৬০০ কোটি টাকা। এটি তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল, একটি অর্বিটার, একটি ল্যান্ডার ও একটি রোভার। এই অরবিটার আজও চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে চাঁদের বর্হিমন্ডল অধ্যয়ন, চন্দ্রপৃষ্ঠের উপাদান এবং খনিজ পদার্থগুলির বিতরণ মানচিত্র এবং মেরু অঞ্চলের উপস্থিত জলের বরফ নিয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলছে। ল্যান্ডারের নামকরণ করা হয়েছিল বিক্রম ও রোবারের নাম ছিল প্রজ্ঞান। চন্দ্রযান-২ মিশনের প্রধান অনুসন্ধানের লক্ষ্য ছিল —

(১) চাঁদের মানচিত্র তৈরি এছাড়া ধুলো, বাষ্প, মাটির নমুনা বিশ্লেষণ করা।

(২) চাঁদের মাটিকে ভবিষ্যতের মহাকাশ অভিযানের ঘাটি করা।

(৩) এছাড়াও থাকতে পারে হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, মিথেন, সোডিয়াম, সিলভারের বিশাল ভান্ডার।

চন্দ্রযান-৩

চন্দ্রযান-৩ হল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এর তৃতীয় এবং সাম্প্রতিকতম চন্দ্র অনুসন্ধান মিশন। এটিতে চন্দ্রযান-২ এর মতো একটি ল্যান্ডার এবং প্রজ্ঞান রোভার রয়েছে, কিন্তু এর কোনো অরবিটার নেই। চন্দ্রযান-৩ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে ১৪ জুলাই ২০২৩ তারিখে ২.৩৫ পিএম এ উৎক্ষেপন হয়েছিল, ২৩ আগস্ট ঠিক সন্ধ্যা ছটা বেজে চার মিনিটে বিক্রম সফলভাবে সফটল্যান্ডিং করে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে এবং প্রথম পর্বের অংশ হিসেবে ১০০ কিলোমিটার বৃত্তাকার মেরু

কক্ষপথে চন্দ্রের অবতরণ সফলভাবে হয়েছিল। প্রকল্পের আওতায় বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে ইসরো সভাপতি কে. সিভান জানান এর ব্যয় হয়েছিল আনুমানিক প্রায় ৬১৫ কোটি টাকা। চন্দ্রযান-৩ এর প্রধান উপাদান —

(১) প্রপালশন মডিউল ঃ প্রপালশন মডিউলটি ১০০ কিলোমিটার চন্দ্রকক্ষপথ পর্যন্ত ল্যান্ডার এবং রোভার কনফিগারেশন বহন করবে। এটি একটি বাক্সের মতো কাঠামো যার একপাশে একটি বড় সৌর প্যানেল ও উপরে একটি বড় সিলিন্ডার বা ল্যান্ডারের জন্য মাউন্টিং হিসেবে কাজ করে।

(২) ল্যান্ডার ঃ চাঁদে অবতরণের জন্য ল্যান্ডার দায়ী। এটি বক্স আকৃতির, চারটি ল্যান্ডিং পা এবং ৮০০ নিউটনের চারটি থ্রাস্টার সহ, ইনসাইট বিশ্লেষণ করার জন্য এটি রোভার এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বহন করবে।

(৩) রোভার ঃ রোভারের কয়েকটি অংশ রয়েছে। যথা —

ক) ছয় চাকার নকশা।

খ) ক্যামেরা, স্পেকট্রোমিটার এবং একটি ড্রিল সহ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র।

গ) একটি চন্দ্র দিনের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল।

চন্দ্রযান-৩ অভিযানের লক্ষ্য ঃ—

ইসরোর তরফে চন্দ্রযান-৩ এর প্রধান তিনটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা —

(১) চাঁদের পৃষ্ঠে ল্যান্ডারটিকে নিরাপদ ও নমনীয় ভাবে অবতরণ করা।

(২) চাঁদে রোভারের লোটারিং ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ ও প্রদর্শন করা।

(৩) চাঁদের গঠন আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য চন্দ্রপৃষ্ঠে উপলব্ধ উপকরণ গুলির উপর ইনসাইট পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা চালানো।

(৪) চাঁদের গর্তগুলিতে কয়েকশো কোটি বছর ধরে সূর্যের আলো পড়েনি তাই সৌরজগতের সৃষ্টির নানা তথা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর অংশটা থেকে। সেই জন্য সেখানে নিশ্চয়ই তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

(৫) চাঁদে থাকতে পারে অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন, সিলভারি, মার্কারি, সোডিয়াম মিথেনের বিশাল ভান্ডার এবং ভবিষ্যতের চাঁদের মাটিতে মহাকাশ অভিযানে কাজে লাগানো। এই সব কারণে চন্দ্রযান অভিযানের গুরুত্ব বেশী হয়ে উঠেছে।

ভারতের সফল মঙ্গলাভিযান ঃ—

ভারতের মহাকাশ গবেষণার পরবর্তী সাফল্যের একটি হলো মঙ্গলাভিযানের সাফল্য। ইসরো ২০১৩ সালে ৫ নভেম্বর মার্স অরবিটার মিশন সংক্ষেপে মম নামে মঙ্গলযানটিকে পিএসেলভি-সি২৫ রকেটের মাধ্যমে মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। এই অভিযানে মাত্র খরচ হয়েছিল ৪৫০ কোটি টাকা। মহাকাশযানটির

৫টি অংশ ছিল — মার্স কালার ক্যামেরা, থার্মাল ইনফ্রারেড ইমেজিং স্পেকটোমিটার, মিথেন সেন্সর ফর মার্স, মার্স একসোস্ফেরিক নিউট্রাল কম্পোজিশন অ্যানালাইজার এবং লাইম্যান আলফা ফটোমিটার। মঙ্গালযান দীর্ঘ ১০ মাস ধরে ছয় লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ২০১৪ সালে ২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গালের কক্ষপথে প্রবেশ করে। বর্তমানে এই যানটি মঙ্গালের কক্ষপথে প্রবেশ করে গ্রহটির বিভিন্ন ছবি ও ভূতাত্বিক তথ্য প্রেরণ করেছে।

ভারতীয় মহাকাশ সংস্থাগুলির গুরুত্ব এখন বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠেছে এবং বিশ্বকে তারা এক নতুন দিক নির্দেশ দিচ্ছে। গত কয়েক বছরে মহাকাশ খাতে নীতি সংস্কার এবং বৈজ্ঞানিক সাফল্য ভারতকে নতুন ভাবে পথ দেখায়।

জীবন সায়াহ্নে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন ঃ "যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে — আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা, আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের উপর আছে।"

মায়ের এই অমোঘ আশীর্বাদ চিরকালের জন্য তাঁর জগৎজোড়া অসংখ্য সন্তানের মঙ্গাল কামনায়। মা নিজে ঘোষণা করেছিলেন ঃ "ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকলেই আমার সন্তান।
আমি মা — জগতের মা, সকলের মা।"

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

শোভারাম মুর্মু (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

"নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।"

বিভিন্ন ভাষা, মত, ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছে ভারত। এই মহান ভারতে অসংখ্য জাতিগোষ্ঠির মধ্যে 'সাঁওতাল' একটি অন্যতম জাতিগোষ্ঠী।

ভারতের ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গে এই সম্প্রদায় বেশি পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও আসাম, ত্রিপুরা, বিহার ও ওড়িশা রাজ্যেও এই সম্প্রদায় রয়েছে।

এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এদের অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে পৃথক করে।

এই সম্প্রদায়ের মানুষজনের মধ্যে কথিত আছে যে, পৃথিবীর প্রথম নর-নারী হলেন পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি। বর্তমানে পৃথিবীর যেখানে যত সাঁওতাল রয়েছে তারা সকলেই পেলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ির বংশধর।

এই সম্প্রদায়ের মানুষজন অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলে গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বসবাস করে। তারা পশুপালন, কৃষিকাজ, বনজ সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে বেশিরভাগ জনই জীবিকা নির্বাহ করে। বেশ কিছুজন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরে চাকরির সাথে যুক্ত রয়েছে।

সাঁওতাল সমাজ মূলত ১২টি গোত্রে বিভক্ত। সেগুলি হল — মুরমু, সরেন, টুডু, বাস্কে, বেসরা, হাঁসদা, হেম্ব্রম, কিস্কু, পাউরিয়া, গুয়াসরেন, মান্ডি এবং চোঁড়ে। পূর্ব রীতি অনুযায়ী সাঁওতালরা সমগোত্রের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। তাদের ভাষার নাম 'সাঁওতালি'। এই ভাষার লিপি হল 'অলচিকি' লিপি।

এই সম্প্রদায়ের মানুষজনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্ববোধের মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। তাদের গ্রামের বিশেষ পাঁচজনকে নিয়ে 'আতু ষোলোআনা' গঠিত হয়, যারা গ্রামটিকে পরিচালনা করেন। সেই বিশেষ পাঁচজন হলেন মাঝি হাড়াম, নায়কে, গোডেৎ, জগমাঝি, এবং পারাণিক। 'মাঝি হাড়াম' হলেন গ্রামের প্রধান, 'নায়কে' ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পূজা উপলক্ষ্যে বলি দেওয়ার দায়িত্ব পালন করে। 'মাঝি হাড়ামের' অনুপস্থিতিতে তাঁর সকল দায়িত্ব পালন করেন পারাণিক। উৎসব তদারকির ভার থাকে জগমাঝির উপর এবং গোডেৎ-এর কার্যাবলী অনেকটা চৌকিদারের মতো।

সাঁওতালদের গ্রামের একটি পবিত্র থান থাকে যার নাম 'জাহের থান'। এখানে প্রধান দেবদেবীর আবাসস্থল। তাদের প্রধান দেবদেবী হলেন 'মারাং বুরু' ও 'জাহের আয়ু'। তাদের অধিকাংশজনের মাটির ঘর-বাড়ি রয়েছে এবং দেওয়ালগুলিতে নানা রঙের কারুকার্য করা থাকে। এই কারুকার্যগুলি মেয়েরা করে থাকে।

সাঁওতালদের জীবনে উৎসব এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের অন্যতম প্রধান উৎসব হল 'সোহরায়'। এই উৎসব হয়ে থাকে কার্তিক মাসে। যদিও এলাকা বিশেষে সময়ের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এই পরবের উদ্দেশ্য হল গরু ও মহিষকে সেবা করা। গবাদিপশুর জন্য যেহেতু চাষাবাদ হয়ে থাকে সেই জন্য তাদের প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই এই পুজো হয়ে থাকে। এই সময় বাড়ির মেয়ে-জামাইরা নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসেন। সেই সময় ছেলে-মেয়ে সবাই রাস্তায় নাচ-গান করে পাঁচদিন পাঁচ রাত আনন্দে মেতে থাকেন। সেই পাঁচ দিনের নামগুলি হল যথাক্রমে 'উম', 'সারদি', 'খুন্টাউ', 'জালে' এবং 'জাজেলে' মাহা।

বসন্তের শুরুতে প্রকৃতির কোলে গাছের ডালে ডালে মহুয়া, বুনো ফল ও ফুলের প্রথম কুঁড়ি আসার সাথে সাথেই সাঁওতালদের অন্যতম প্রধান উৎসব 'বাহা' পরব হয়। এই পরব 'জাহের থান'-এ হয়। এই পুজো সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সাঁওতাল মেয়েরা কোনো ফুল খোঁপায় লাগাতে পারে না। তাদের দুটি ড্রাম 'টামাক' ও 'তুমডাক'-এর বাজনা বাজিয়ে তারা নৃত্য করে।

প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর 'মাঃ মড়ে' পূজা হয়ে থাকে। এটিও অন্যান্য পুজোর মতো তারা ধামসা মাদল নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে।

এছাড়াও 'এর সিম', 'দাঁশায়' ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসব পালনের মধ্য দিতে তারা আনন্দে মেতে থাকে।

আনন্দ তিন প্রকার — বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। যা সর্বদাই নিয়ে আছে — কামিনী কাঞ্চনের আনন্দ — তার নাম বিষয়ানন্দ। ঈশ্বরের নাম গুণগান করে যে আনন্দ তার নাম ভজনানন্দ। আর ভগবান দর্শনের যে আনন্দ তার নাম ব্রহ্মানন্দ।

— শ্রীরামকৃষ্ণ

কী নিষ্ঠুর!

বিপল মণ্ডল (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

এক গ্রীষ্মের পড়ন্ত বিকালে,
পাখির ফেলে যাওয়া মলে ছিল আমার প্রাণ।
আমি সুপ্ত, আমি গুপ্ত ছিলাম কটা দিন।
হঠাৎ গগনে, ঘনঘটা মেঘে ঢেকে গেল চারিদিক;
টিপ টিপ বৃষ্টির কণা, ফেরালো আমার চেতনা, ভাঙালো ঘুম।
জানিনা মায়ের থেকে আছি কতো দূরে,
এই প্রকৃতির কোলে জাগিলাম।
উঁকি দিয়ে দেখি, এ জগৎ কি অপূর্ব সুন্দর।
না চাইতে বায়ু, না চাইতে জল, আলো আরোও কতো আয়োজন।
এ পৃথিবী যেন আমারই জন্য ছিল অপেক্ষায়, তাই এতো আপ্যায়ন।
ঠাণ্ডা; গরম; বৃষ্টি, এ পৃথিবী লাগে ভারী মিষ্টি।
হলাম বড় একটু একটু করে, এখন আমি সবার উপরে।
ফুল দিই, ফল দিই; পাখিরা বাঁধে বাসা।
রোজ সকালে আসে প্রজাপতি আর মৌমাছির দল নিয়ে যায় মধু।
ওই যে পাশের বাড়ি, মাঝে মাঝেই ওরা আসে;
শুকনো ডাল, আমার ঝরে যাওয়া পাতা, ওরা নিয়ে যায়।
ক্লান্ত পথিক যখন এসে বসে দেয় ঠেস;
এক অনন্য স্নেহের ভালোবাসা লাগে ভারী বেশ।
এ পৃথিবীতে এমন ভালোবাসা লাগে ভারী বেশ।
এ পৃথিবীতে এমন ভালোবাসা পেতে বারে বারে জন্মাতে চাই।
বসন্তের ঝলমলে রোদ, মিষ্টি ফুলের সুবাস।
কিছুক্ষণ আগে মধু নিয়ে গেল কয়েক ঝাঁক মৌমাছি;
এখন কতগুলো শালিক জুড়েছে গপ্পো।
আমি তো সব শুনি আর হাসি; কি মজা!

একি! একি! পাশের বাড়ির ওরা আমায় বাঁধছে কেনো?
শালিকেরা গল্প ছেড়ে উড়ে গেল; শুনবো না?
এক, দুই, তিন; উফফ! কি যন্ত্রণা!
কুড়ালের কোপে কি নৃশংস ভাবে কাটছে আমায়।
অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছি, উফফ্!
এ স্নিগ্ধ বাতাস, এ আলো এখন যন্ত্রণার।
আমি পড়ে যাচ্ছি, হে পৃথিবী আমাকে ধরো।
হয়তো এটাই শেষ নিঃশ্বাস।
কি ছিল আমার দোষ? ওদেরকে ভালোবেসে করেছিলাম ভুল?
পরিণাম শুভ হোক সবার; না যেনো হয় আমার মতো।

ছৌ-নাচ

প্রদ্যুৎ মাহাতো (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

ছৌ-নাচ মূলত একটি ভারতীয় আদিবাসী যুদ্ধ নৃত্য। তবে ছৌ-নৃত্য নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন মতামত দেখা যায়। সর্বপ্রথম আমরা দেখি ডঃ পশুপতি প্রসাদ মাহাতো ও ডঃ সুধীর করের মতে এই নাচের নাম 'ছো'। আবার অন্যদিকে আমরা দেখি বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ বঙ্কিম চন্দ্র মাহাতোর মতে এই নাচের নাম 'ছ'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সর্ব প্রথম 'ছৌ' নামের সূচনা করেন। তখন থেকেই এই 'ছৌ' নাম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এইভাবে এই ছৌ নামকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মতামত দেখা যায়।

এটি মূলত বেশির ভাগ পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা রাজ্যে দেখা যায়। যদি 'ছৌ' নাচের উৎপত্তি হিসাবে দেখি তাহলে মূলত আমরা পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলাকে উৎপত্তিস্থল বলবো। তবে এই ছৌ-নৃত্য বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নামে পরিচিত। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সরাইকেল্লা ছৌ, অন্যদিকে ময়ূরভঞ্জ ছৌ উৎপত্তি স্থল ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলা, আর পুরুলিয়ার ছৌ পুরুলিয়ার 'ছৌ' নামেই পরিচিত। পুরুলিয়া 'ছৌ' ও সরাইকেল্লা 'ছৌ' নৃত্যের ক্ষেত্রে আমরা যেমন বিভিন্ন দেব-দেবীর মুখোশ দেখতে পায়। অন্যদিকে ময়ূরভঞ্জ ছৌ-নৃত্য ক্ষেত্রে সেইভাবে মুখোশ দেখতে পায় না। পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি থানার অন্তর্গত চড়িদা গ্রামের 'ছৌ'-নাচের মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা — (ক) বাঘমুণ্ডি ঘরানা, (খ) ঝালদা ঘরানা (গ) আড়ষা ঘরানা (ঘ) বান্দোয়ান ঘরানা। এই চারটি ঘরানা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তবে এই চার ঘরানার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। এই ছৌ-নাচ যে সব জনজাতির মানুষ বেশিরভাগ করে থাকেন তাদের মধ্যে হলেন — কুড়মি, মুণ্ডা, কুমহার, সহিস, রাজোয়াড়, ডোম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষজন।

এই ছৌ-নৃত্য করা হয় চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে। বৈশাখ ও চৈত্র মাসে 'শিবের গাজন' উপলক্ষ্যে এই নাচের আসর বসে। এই 'ছৌ' নৃত্যের মাধ্যমে বেশির ভাগ যেগুলো দেখানো হয় সেগুলি হল — রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন উপাখ্যান অভিনয় করে দেখানো হয়। পৌরাণিক বিভিন্ন দেব-দেবীর কাহিনী দেখানো হয়। তবে বর্তমান সময়ে 'ছৌ' নৃত্যের মাধ্যমে জনপ্রিয় কোনো সামাজিক ঘটনা নৃত্যের মাধ্যমে তুলে ধরে। এই নাচের ক্ষেত্রে ৬টি জিনিস ব্যবহার করা হয় — ঢোল, ধামসা, সানাই, পোশাক ও মুখোশ। নাচের ক্ষেত্রে ৬টি পথ দেখানো হয় — মড়প বেড়ানো, আসর বাঁধার উড়ান, বাজনা বন্দনা, মেলানাচ, পালানাচ ওস্তাদি-নাচ ইত্যাদি। প্রথম নাচ শুরু হবে ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে। তারপর গায়ক গণেশ বন্দনা, গণেশের মুখোস রূপ নিয়ে যিনি নাচের মধ্যে প্রবেশ করবেন। তারপর বিভিন্ন দেব-দেবীর আবির্ভাব ঘটে, তারপরে অসুর, পশু-পাখি বেশধারী প্রবেশ করেন। ছৌ-শিল্পীদের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি হলেন — হেম মাহাত, পুরুলিয়ার 'ছৌ' এর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি পুরুলিয়া 'ছৌ' নৃত্যকে নতুন রূপ দেন। তিনি ১২ বছর বয়স থেকে বাবা

ও ঠাকুরদার কাছ থেকে 'ছৌ' নাচ শিখতে যেতেন। পড়াশোনার সাথে সাথে তিনি গ্রামের ছৌ-নাচ অনুশীলনে অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়াও আরও কয়েকজন বিখ্যাত 'ছৌ' শিল্পী হলেন — দেবীলাল কর্মকার, জগন্নাথ চৌধুরী, গম্ভীর সিং মুড়া। এরা দেশ-বিদেশে বিভিন্ন খ্যাতি লাভ করেছেন।

'ছৌ' নৃত্য একটি পুরুষ প্রধান শিল্প, পুরুষ এর পাশাপাশি একজন তরুণী মৌসুমী চৌধুরি যিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি স্থানীয় মহিলাদের ছৌ-নৃত্যে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। ইদানীং পুরুষ ছৌ নৃত্যের পাশাপাশি মহিলা ছৌ-নৃত্যের দল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মৌসুমী চৌধুরী এই ছৌ-নৃত্যের ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন পুরস্কার এবং খ্যাতি লাভ করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ—

১) কুম্ভকার, হরেকৃষ্ণ — সীমান্ত বাঙলার ছৌ-নৃত্য সেকাল-একাল।
২) চৌধুর মলয় — সংস্কৃতি পুরুলিয়া।
৩) মান্না, শিবেন্দু — লোকায়ত শিল্পকলা ছৌ নাচের মুখোশ।
৪) কুমার, গম্ভীর — অনন্য ছৌ শিল্পী পদ্মশ্রী গম্ভীর সিং মুড়া।

স্নান করে ঠাকুরকে প্রত্যহ প্রণাম করবে আর প্রত্যেক কাজে তাঁকে স্মরণ করবে। এতেই জপধ্যানের কাজ হবে। ...খুব ভোরে আর রাত্রে ঘুমোবার আগে যা পার তাই কোরো। ধ্যানজপ করা তাঁকে লাভ করার জন্য; তাঁর কৃপা পেয়েছ বলেই এখানে এসেছ।

— শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

সুন্দরবনের মৎস্যজীবী

উজ্জ্বল দাস (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

সুন্দরবন হলো বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশস্ত বনভূমি; যা পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর অববাহিকার ব-দ্বীপ এলাকায় অবস্থিত এই বিশাল বনভূমি বাংলাদেশের খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগের হাট জেলার কিছু অংশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দুই জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা জুড়ে বিস্তৃত। সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ অরণ্য হিসেবে সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখণ্ড বনভূমি।

সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাসকারী বেশির ভাগ মানুষ নদী ও সমুদ্রের কাছাকাছি থাকার জন্য তাদের জীবিকা মৎস্য শিকার।

এখানকার মানুষরা কেউ সমুদ্রে ট্রলার নিয়ে মাছ ধরতে যায়। কেউ আবার নৌকা নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে যায়। আবার অনেকেই মহিলা, পুরুষ শুধু হাত দিয়ে মাছ ধরতে যায়। ১৯৭৩ সালে ব্যাঘ্র প্রকল্প প্রতিষ্ঠার পর থেকে মৎস্যজীবীদের উপর নিরন্তর অত্যাচার করে চলেছে। তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সুন্দরবনের নদী, খাঁড়ি জঙ্গালে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার, সুন্দরবনের কোর এলাকায় ও সীমানা অঞ্চলে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের বনদফতর ও বি.এস.এফ-এর অত্যাচারে জীবন বিপন্ন। তাই মৎস্যজীবীদের দাবি তাঁদের সুন্দরবনের মাছ ধরার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। সীমান্ত এলাকায় মৎস্যজীবীদের জীবিকাকে সুরক্ষিত করতে হবে, কিন্তু কোনোদিন জঙ্গালে মাছ ধরার অধিকার তারা পায়নি। আজও পাইনি। তারা চুরি করে জঙ্গালে গিয়ে বাঘের শিকার হয়েছে, বহু মানুষের প্রাণ হারিয়েছে, তাদের সংসারে ছেলে-মেয়ে কষ্ট পেয়ে বড়ো হয়েছে।

এইসব সমস্যা নিয়েই ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা দাবি করেছেন, তারা প্রতিবাদ করেছেন, বিক্ষোভেও সামিল হচ্ছেন। বর্তমানে 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্প থেকে মৎস্যজীবী রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে। তাতে কোনা মৎসজীবি মাছ ধরতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গেলে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন। এটা মৎস্যজীবীদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফল। কিন্তু তাদের সমস্যা মেটে না যারা চুরি করে মাছ ধরতে যায় তারা যদি মারা যায় বাঘের কাছে, তাদের টাকা দেওয়া হয় না। তবু তারা মাছ, কাঁকড়া ধরতে যায়। তাদের জীবনযাত্রা কোনো ভাবে চালানোর জন্য।

মৎস্যজীবী হল সমাজের বন্ধু। ভালো বন্ধু না থাকলে ভালো সমাজ কিভাবে গড়ে উঠবে!

দর্শন অনুষঙ্গ

মনোরঞ্জন পাল (অধ্যাপক)

দর্শন-এর অর্থ দেখা। কিন্তু কেবলমাত্র দেখাকেই দর্শন বলে না। আমাদের মনের সেই সব যা কোনো বস্তুকে প্রত্যক্ষণ করার পর সেই বস্তু সম্পর্কে মনের মধ্যে যে অনুসন্ধিৎসা তৈরি হয় তাই হল দর্শন। যেমন কোনো ব্যক্তি তা সে সাধারণ ব্যক্তি থেকে বা বিশেষ ব্যক্তি বা বয়স্ক ব্যক্তি বা ছোটো ব্যক্তি, সৎ ব্যক্তি বা অসৎ ব্যক্তি যে কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়কে প্রত্যক্ষণ করার পর সেই বিষয় সম্পর্কে তার মনে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন আসতে পারে। সেই প্রশ্নগুলি দর্শনের উৎস।

দৃশ ধাতু ও অনট প্রত্যয় (দৃশ+অনট) যোগে দর্শন শব্দের উৎপত্তি। যেমন-তেমন দেখা দর্শন নয়। দেখা যা মনের অন্তরদৃষ্টি দিয়ে দেখা; যুক্তিসঙ্গত চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা। যেমন — ধরে নেওয়া যাক আমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কথা মনে করি সেটা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়। কিন্তু মনের অন্তরদৃষ্টি দিয়ে এই সম্পর্কে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে মনের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নের উদয় হতেই পারে। সেই প্রশ্নে অর্থাৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কী, কীভাবে এর সৃষ্টি, কীভাবে বা কখন এর সমাপ্তি ইত্যাদি প্রশ্ন সম্পর্ক যখন যুক্তিসঙ্গত ও নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম হল।

ইংরেজিতে দর্শন হল Philosophy যা দুটি কথার সংযুক্তি। এক হল Philos; যার অর্থ হল প্রেম বা অনুরাগ। অপরটি হল Sophia; যার অর্থ হল জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। অর্থাৎ জ্ঞান বা প্রজ্ঞার প্রতি ভালোবাসাই হল দর্শন। তবে এখানে জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা অপেক্ষা প্রজ্ঞার প্রতি ভালোবাসা বলাটা অধিক যুক্তিসঙ্গত।

দর্শনের সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাদের কয়েকটি নিম্নে প্রদান করা হল। যেমন —

দর্শন হল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান।

দর্শন হল সত্যতা সম্পর্কে যাচাই করার এক উন্মুক্ত প্রয়াস।

দর্শনের পরিধি হল ব্যাপক ও বিস্তৃত। যে কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার যে প্রয়াস তাই দর্শন। তা সে যা কিছু হতে পারে যেমন — ঈশ্বর, ঈশ্বরের অস্তিত্ব এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড; আমাদের আত্মা, পরমাত্মা, আমাদের কৃষ্টি বা সংস্কৃতি এমন কী আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুখময় ও আরামদায়ক করে তোলার জন্য বিভিন্ন দৃষ্টি পদ্ধতি সবই দর্শনের পর্যায়ভুক্ত।

দর্শনের বিষয়বস্তু মূলত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে আছে। যথা — [i] তথ্য মীমাংসা (Meta Physics); [ii] জ্ঞান মীমাংসা (Apistomology); [iii] যুক্তি মীমাংসা (Axiology)।

বিষয়বস্তুর এই তিনটি ধারণা সম্পর্কে স্পষ্ট মত প্রদান করার জন্য, দর্শন মানে যে দেখা, তা কেমন দেখা সে সম্পর্কে আলোচনা করে নিলে বিষয়টির সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। দেখা, তা সে কী রকম দেখা বা কীভাবে দেখা। দ্বিতীয়ত কী দেখা, তৃতীয়ত কেন দেখা। এই তিন প্রকার দেখা দর্শনের বিষয়বস্তু।

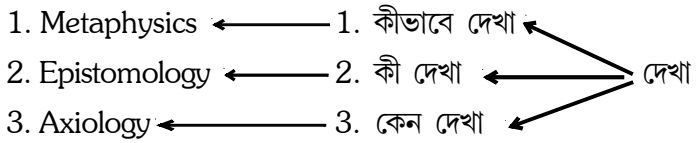

উপরিউক্ত ছকটি থেকে যে ধারণা আমরা পাচ্ছি তাই হল দর্শনের বিষয়স্তু। যেমন — 1. তত্ত্ব মীমাংসা [Metaphysics] এখানে দুটি কথার ধারণা আমরা পাই — 1. Meta, 2. Physics বা ভৌতিক অর্থাৎ ভৌতিক মানে হল যা আমরা স্পর্শ করতে পারছি, দেখতে পাচ্ছি বা অনুভব করতে পাচ্ছি। আর Meta বলতে এখানে না-বাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ ভৌতিক সেইসমস্ত বিষয়বস্তু যা দেখতে পাচ্ছি না। যেমন — বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, ঈশ্বর, আত্মা, পরমাত্মা ইত্যাদি সম্পর্কে দেখতে গেলে তা আমরা কীভাবে দেখছি তা উত্তরই হল দর্শনের বিষয়বস্তুর তত্ত্ব মীমাংসা বা Metaphysics।

জ্ঞান মীমাংসা অর্থাৎ (Epistomology) হল দর্শনের দ্বিতীয় বিষয়বস্তু। যেমন — কী দেখা? অর্থাৎ আমরা কোনো বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করার পূর্বে যে দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করি তা হল দর্শনের Epistomology বা জ্ঞান মীমাংসার অন্তর্গত বিষয়বস্তু।

Axiology বা যুক্তি মীমাংসা হল দর্শনের তৃতীয় বিষয়বস্তু অর্থাৎ যে গুলোকে আমরা দেখছি তা কেন দেখছি সে সম্পর্কেই যুক্তি নির্ভর বা যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা প্রদানই হল Axiology। এই Axiology তিন প্রকার শাস্ত্র দ্বারা কোনো বিষয় সম্পর্কে দেখার যুক্তি প্রদান করে থাকে। যেমন — 1. যুক্তি শাস্ত্র, 2. তর্ক শাস্ত্র, 3. সৌন্দর্য শাস্ত্র। দর্শনের এই বিপুল পরিধি আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে থাকে।

সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা — সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়।

— শ্রীরামকৃষ্ণ

ভারত ভাগ কি সত্যিই অনিবার্য ছিল?

কালোসোনা মণ্ডল (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। প্রকৃতি ভারতবর্ষকে এক অপূর্ব রূপ দান করেছে। ভারতীয় সম্পদ, সভ্যতা, সংস্কৃতি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করে নিয়েছে। ভারতীয় সম্পদের উপর বিদেশিদের নজর পড়েছিল। কখনো আরবরা, কখনো সুলতানিরা, কখনো মুঘলরা, আবার কখনো ইংরেজরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে বিভিন্ন কারণে। কেউ সম্পদের লোভে, কেউ আবার কখনো ব্যবসা-বাণিজ্যের অজুহাতে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে ফিরে গিয়েছে, আবার কেউ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে এদেশের থেকে ছলে-বলে-কৌশলে আমাদের মহামূল্যবান সম্পদ নিজেদের দেশে চালান করেছে।

যে সমস্ত বিদেশি শক্তি আমাদের দেশে লুণ্ঠন চালিয়েছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে শেষে এসেছিল ইংরেজরা। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের অজুহাতে আমাদের দেশে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু তারা ধীরে ধীরে ছলে-বলে-কৌশলে আমাদের দেশের সমস্ত ক্ষমতাকে নিজেদের আয়ত্ত্বে নিয়ে নেয় এবং ভারতীয় সম্পদকে একদিকে তারা যেমন লুণ্ঠন চালিয়েছিল, ঠিক তেমনি অন্যদিকে ভারতবাসীর উপর নানান অমানবিক অত্যাচারের যাঁতাকলে পেষণ করেছিল। তাই ভারতবাসী এই অমানবিক স্বৈরাচারী শোষণের যাঁতাকল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ও নিজেদের দেশকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ সরকারের অমানবিক পুলিশ বাহিনীর অত্যাচারে অনেক বিপ্লবীকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল নিজেদের মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য।

বিপ্লবীদের মরণপণ লড়াইয়ের ফলে ইংরেজ সরকার বুঝে গিয়েছিল ভারতবর্ষ আর তাদের পক্ষে নিরাপদ নয়; তাই তারা ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। ভারতমাতার দামাল সন্তানদের অনেক ত্যাগ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট মধ্যরাত্রিতে সমগ্র পৃথিবী যখন নিদ্রামগ্ন সেই সময়ে সমগ্র ভারতবাসী ঘণ্টাধ্বনির মাধ্যমে এক প্রবল উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল।

ভারতবাসী বিদেশিদের দেওয়া যন্ত্রণা বিশেষ করে প্রায় ২০০ বছর ব্রিটিশদের অধীনে থাকার পর সেই শোষণের বেড়াজাল থেকে ১৯৪৭ খ্রিঃ ১৫ই আগস্ট মুক্তি পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু তার আগের দিন অর্থাৎ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট ঘটে গিয়েছিল এক দুঃখময় ঘটনা। ভারত ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল আলাদা পাকিস্তান রাষ্ট্র।

এই ভারতবর্ষ কেন বিভক্ত হয়েছিল তার জন্য কে বা কারা দায়ী ছিল তা নিয়ে তীব্র মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়।

ভারত ভাগের জন্য অনেকে জিন্নাকেই দায়ী করেছেন। লিওনার্ড ভোঁশলে বলেন যে — 'পাকিস্তান হল জিন্নার একক অবদান'। কেবলমাত্র ভোঁশলেই নয় আরো অনেক ঐতিহাসিক দেশভাগের জন্য জিন্নাকে দায়ী করেছেন।

আবার অনেক ঐতিহাসিক দেশ ভাগের জন্য ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতিয়ার Divide and Rule-কে দায়ী করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই তারা ভারত বিভাগ করে।

অন্যদিকে রজনীপাম দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এ. আর. দেশাই, সুমিত সরকার প্রমুখ মার্কসবাদী পণ্ডিতগণ এজন্য জাতীয় কংগ্রেসের উপর দোষারোপ করেন। রজনীপাম দত্ত, হীরেন মুখোপাধ্যায় তো জাতীয় কংগ্রেসকে বিশ্বাসঘাতক অ্যাখ্যা দিতেও কসুর করেনি। আসলে এই সব অভিযোগের কোনোটিকেই পূর্ণ যথার্থ বলে অ্যাখ্যায়িত করা যুক্তি সম্মত হবে না।

ভারত বিভাগে জিন্নার কিছুটা দায়িত্ব থাকলেও তিনিই সব নন এবং একমাত্র দায়ী নয়। একদা জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের রাজদূত হিসাবে চিহ্নিত জিন্না কখনোই কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না এবং সত্যিই তিনি পাকিস্তান চাননি। মৌলানা আজাদ থেকে সাম্প্রতিক কালের পাকিস্তানি ঐতিহাসিক ডঃ আয়েষা জালাল এই মত পোষণ করেন। গান্ধীজি, প্যাটেল, নেহরুর সঙ্গে মত পার্থক্য ছিল, তেমনি সমকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকের সঙ্গেই তার বনিবনা ছিল না। তার লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান পরিকল্পনার মাধ্যমে মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করা।

১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর সরকার গঠন কালে মুসলিমলীগ তাদের ২ জন সদস্যকে উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করার অনুরোধ জানায়। এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলে জিন্না প্রবলভাবে কংগ্রেস বিরোধী হয়ে ওঠেন। এ সম্পর্ক আর জোড়া লাগেনি। দিন-দিন ব্যবধান বাড়তে থাকে এবং তার শেষ পরিণতি হল 'ভারত বিভাগ'।

কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় বিরোধ নয়, দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। লীগ সমর্থক, উদীয়মান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা টাটা-বিড়লার আধিপত্য মানতে রাজী ছিলেন না। অনুরূপভাবে নবাব, তালুকদার ও উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানরাও হিন্দু প্রাধান্য মানতে চাননি। বাংলাদেশে মুসলিম বর্গাদারদের হিন্দু-জমিদারদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হয়। এইভাবে সাধারণ মুসলিমদের মন পাকিস্তানমুখী করে তোলা সহজ হয়।

ভারত বিভাগের জন্য ব্রিটিশের 'Divide and Rull' নীতিকেই দায়ী করা হয়। ইংরেজ শাসনের সূচনায় ইংরেজরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের এবং পরে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের তোষণ করতে থাকে। মুসলিমলীগ সৃষ্টিতে এবং ভারতে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধিতে ইংরেজদের ভূমিকাকে অস্বীকার করা

যায় না। কিন্তু এ সত্ত্বেও বলা যায় ইংরেজ সরকার ভারত বিভাগের বিরোধী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এটলি ও বড়োলার্ট মাউন্ট ব্যাটেন চেয়েছিলেন অখণ্ড ভারত। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে তারা শেষ পর্যন্ত ভারত ভাগে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি বলেছিলেন যে, — "আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ ভারত চেয়েছিলাম কিন্তু চেষ্টা করা সত্ত্বেও তা ব্যর্থ হয়।" বলা যায় যে, মাউন্ট ব্যাটেন অতো তাড়া-হুড়ো না করে একটু ধৈর্য্য ধরে এগোলে হয় তো দেশভাগ এড়ানো যেত। বলাবাহুল্য তৎকালীন পরিস্থিতিতে তা কখনোই সম্ভব হত না। বড়োজোর সময়ের কিছুটা হেরফের হতে পারতো। কারণ যদি আমরা লক্ষ্য করি, দেখতে পাই যে, ১৯০৮ খ্রিঃ পর থেকেই একের পর এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতে লেগেই চলেছিল। সুতরাং দেশভাগ সময়ের অপেক্ষা ছিল মাত্র।

দেশভাগের জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করা হয়। বলা হয় যে—

[i] গান্ধীজি যদি দেশভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে একাই আন্দোলনে নামতেন, তাহলে অসংখ্য শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তাঁর পাশে দাঁড়াত।

[ii] বলা হয় যে, জাতীয় আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে কংগ্রেস নেতাদের জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়ে পড়ে এবং রণক্লান্ত এই সব নেতারা ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে দেশভাগ মেনে নেন।

[iii] মার্কসবাদী পণ্ডিতরা বলেন যে, — কংগ্রেস ১৯৪৬-৪৭ -এর গণ-বিদ্রোহে আতঙ্কিত হয়ে সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ক্ষমতা ভাগ করে নেয়। এ সময় কংগ্রেস যদি সকল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিকে একত্রিত করে আন্দোলনে নামতেন তাহলে হয়তো ভারত ভাগ এড়ানো যেত।

বিভিন্ন মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা যেভাবে গান্ধীজি ও জাতীয় কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেছেন তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন ড. অমলেশ ত্রিপাঠি। তিনি বলেন যে —

[i] ১৯৪৭-এ যে কমিউনিস্ট পার্টি ভারতছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, সেই কমিউনিস্ট পার্টির কোনো নৈতিক অধিকার নেই ১৯৪৬-এ জাতীয় কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ না নেবার জন্য সমালোচনা করার।

[ii] ড. ত্রিপাঠি বলেন যে, জাতীয় কংগ্রেস যখন পাকিস্তান প্রস্তাব বা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল এবং ক্রিপস প্রস্তাবে গান্ধীজি যখন পাকিস্তানের গন্ধ পেয়ে তা প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ঠিক তখন সেই কমিউনিস্ট পার্টির থিসিসে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানো হয়।

[iii] ১৯৪৫-৪৬ -এ দেশের পরিস্থিতি কতটা বিপ্লবের অনুকূল ছিল এবং বিপ্লব ঘটালে তা কতটা বিপ্লবের পক্ষে সফল হত তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। ড. ত্রিপাঠি প্রশ্ন তুলেছেন —

তিনি বলেন যে, তখন দেশ যদি সত্যি বিপ্লবের প্রতি প্রস্তুত থাকে তাহলে কমিউনিস্টরা সে দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে না নিয়ে তা কেন গান্ধীজির উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। এখানে বলা দরকার যে, গান্ধীজি কখনো সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন না। আর কংগ্রেস আন্দোলন করলেই দেশভাগ এড়ানো

যেত তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? আসলে তখন অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, দেশভাগ মেনে নেওয়া ছাড়া কংগ্রেসের সামনে কোনো বিকল্প ছিল না।

বামপন্থী ঐতিহাসিক ড. বিপানচন্দ্র বলেন যে, ১৯৪৭-এ নেহেরু, প্যাটেল ও গান্ধীজি শুধুই যা অবশ্যম্ভাবী তা মেনে নিয়েছিলেন —

[i] লীগের কার্যকলাপে অন্তবর্তী সরকারের অচলাবস্থার সৃষ্টি। প্রতি পদে বাধা সৃষ্টি করে লীগ মন্ত্রীগণ সরকারকে অকেজো করে দেয়। পারস্পরিক সন্দেহ ও বিদ্বেষ তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তার কোনো সমাধান সম্ভব ছিল না। প্যাটেল অভিযোগ করেন — বাংলা ও পাঞ্জাবে কার্যত একটি পাকিস্তান সরকার ক্ষমতাসীন ছিল।

[ii] সারা দেশ জুড়ে তখন এত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হানাহানি চলেছিল যে, তার বন্ধ করার একমাত্র উপায় ছিল দেশভাগ। অন্যথায় দেশ আরো চরমে পৌঁছাতো।

[iii] কেবলমাত্র পাকিস্তানের সমস্যা নয়, ভারতের অভ্যন্তরে ছিল তখন অসংখ্য দেশীয় রাজ্য। দেশীয় রাজ্যগুলির সমস্যার সমাধান না হলে ভারত যে আরো কত গুলি খণ্ডে বিভক্ত হত তার ঠিক নেই।

[iv] কংগ্রেস মনে করেছিল যে, দেশভাগ ছিল একটি সাময়িক ঘটনামাত্র। উত্তেজনার অবসানে মানুষের মনে শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে এবং দুর্বল পাকিস্তান নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আবার ভারতের সঙ্গে মিশে যাবে বলা বাহুল্য বাস্তবে তা হয়নি।

পরিশেষে বলা যায়, যে দেশ ভাগের জন্য কেউ বা কাউকে পুরোপুরি দায়ী করা যায় না বা কেউ সামান্য হলেও নিজ দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। তাই বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে সহমত হয়ে বলা যায় যে —

"ইংরেজ দেশভাগ করে দিয়ে গেল এটা পূর্ণ সত্য নয়। কংগ্রেস দেশভাগ করিয়ে নিল এটা অনেকটা সত্য।"

তাই আমরা দেশভাগের জন্য জিন্নাকে পুরোপুরি দায়ী করি না। এমনকি ইংরেজদেরকেও না।

তথ্যসূত্র ঃ—

১) পলাশী থেকে পাটিশান ও তারপর — শেখর বন্দোপাধ্যায়

২) আধুনিক ভারত — সুমিত সরকার।

৩) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম — বিপান চন্দ্র (১৮৫৭-১৯৪৭)।

৪) আধুনিক ভারত — জীবন মুখোপাধ্যায়।

কাজ ও অবসাদ

শুভ পরামানিক (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

মানুষের সব রকম চেষ্টার মূলেই এক বিশেষ মানসিকতা কাজ করে সেটি হল, সবচেয়ে কম শ্রম করে, কী করে সবচেয়ে বেশি ফল পাওয়া যায়। সভ্যতার মানদণ্ডেও মানুষের কর্ম ক্ষমতাকে এই দিক থেকেই বিচার করা হয়। মানুষের শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও একই মানসিকতা ও একই মানদণ্ড পাওয়া যায়। কোন ছাত্র কত তাড়াতাড়ি শিখতে পারে, কোন ছাত্র সবচেয়ে কম শ্রম ব্যয়ে অধিক পরিমাণে শিখতে পারে তা দিয়েই বিচার করা হয় তার শিখন ক্ষমতা। সুতরাং, যে কোন ধরনের চেষ্টিত কাজ ও তার জন্য ব্যয়িত শক্তির অনুপাতের উপর নির্ভর করছে ব্যক্তির কর্মক্ষমতা। ব্যক্তির এই কর্মক্ষমতা তার জীবনের মূল্য নিরূপিত করে। কর্মক্ষমতার প্রকৃতি, ব্যক্তির শিক্ষা, কাজকে কীভাবে প্রভাবিত করে সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের সর্বপ্রথম কাজ কী সেই সম্বন্ধে জানা দরকার।

—ঃ কাজ [Work] ঃ—

পদার্থ বিজ্ঞানীগণ [Physicist] বলেন, কোনো একক পরিমাণ বস্তুকে একক পরিমাণ দূরত্বে স্থানান্তরিত করাকে কাজ বলা যেতে পারে। শারীর বিজ্ঞানীগণ [Physiologist] বলেছেন যে, প্রতিক্রিয়ার জন্য আমাদের স্নায়বিক শক্তির খরচ হয়, তাই হল কাজ। এই সংব্যাখান অনুযায়ী, মানুষের সবরকম প্রতিক্রিয়ার সামাজিক মূল্য আছে, যেসব প্রতিক্রিয়া আমাদের জীবিকা উপার্জনে সহায়তা করে, তাই হল কাজ। কিন্তু এটি কাজের সংকীর্ণ অর্থ। মানুষের যে কোনো রকম প্রতিক্রিয়াকেই আমরা কাজ বলতে পারি, যদি তার জন্য স্নায়বিক শক্তির খরচ হয়। মনোবিদ্ ড্যাট্সী [Deitze] বলেছেন, কাজ এবং খেলার মধ্যে কোনো প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই, তাদের মধ্যে পার্থক্য মনোভাবগত।

অনেকে উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করে, কাজকে দু'শ্রেণিতে ভাগ করেছেন — অচেষ্টিত কাজ [Non-voluntary action] এবং চেষ্টিত কাজ [Voluntary action]। অর্থাৎ যে কাজের পিছনে সক্রিয় মানসিক ইচ্ছা থাকে না, তাকে বলে অচেষ্টিত কাজ। আর যে কাজের পিছনে সক্রিয় মানসিক ইচ্ছা থাকে, তাকে বলা হয় চেষ্টিত কাজ। কাজকে অন্য একদিক থেকেও দু'ভাগে ভাগ করা হয় — দৈহিক কাজ [Physical work] এবং মানসিক কাজ [Mental work]। কোনো ব্যক্তি যখন কাজ করার জন্য দৈহিক শ্রম ব্যয় করে, তখন সেই কাজকে বলা হয় দৈহিক কাজ। যেমন — কোনো বোঝা তোলা। আবার, কোনো কাজ করার জন্য যখন মানসিক শ্রম ব্যয় হয়, তখন তাকে মানসিক কাজ বলে। যেমন — অঙ্ক করা। মনোবিদ্গণ পরীক্ষা করে দেখেছেন, সবরকম কাজেই স্নায়বিক শক্তির ক্ষয় হয়। সুতরাং, তাদের পৃথক করা খুব মুশকিল। শুধুমাত্র বলা যেতে পারে, কোথাও বৃহৎ পেশি কাজে লাগে আবার কোথাও ক্ষুদ্র পেশি কাজে লাগে মাত্র। তাই সম্পূর্ণরূপে তাদের পৃথক করা যায় না।

কাজ যে রকমেরই হোক না কেন, তাতে শক্তি ব্যয়িত হয় এবং অনেকক্ষণ কাজ করার পর শক্তি ক্ষয় হওয়ার ফলে কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়। একটি যন্ত্রকে অনেকক্ষণ ধরে কাজ করালে তার জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার ফলে, তার কর্মক্ষমতা কমতে থাকে। যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ক্ষয় হওয়ার ফলেও কর্মক্ষমতা কমে। তেমনি, মানুষ যখন কোনো কাজ করে, তার স্নায়বিক শক্তি ক্ষয় হওয়ার ফলে কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসে। মানুষের ক্ষমতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, তা ধীরে ধীরে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। মনোবিদ্‌গণ এই হ্রাসের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন, দুটি প্রধান কারণে এই কর্মক্ষমতার ক্রমাবনতি হয়। প্রথমত, প্রেষণা [Motivation] না থাকার দরুণ। দ্বিতীয়ত, অবসাদ [Fatigue] এর দরুণ। কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তির উৎসাহের অভাব ঘটলে, তার কাজের হার কমে যেতে থাকে। কাজের প্রকৃতি ভেদে, উদ্দেশ্য ভেদে এবং ব্যক্তি ভেদে এই প্রেষণারও তারতম্য হয়। অর্থাৎ, যে কাজে একজন ব্যক্তি উৎসাহিত হবে, অপর একজন ব্যক্তি সেই কাজে উৎসাহিত নাও হতে পারে। শিশুর কাছে যে কাজ নিতান্তই খেলা, বয়স্কদের কাছে সেই কাজের পেছনে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

—ঃ অবসাদ [Fatigue] ঃ—

অবসাদ হল কর্মক্ষমতা হ্রাসের সার্বজনীন কারণ। এই অবসাদ কী? এ নিয়ে মনোবিদ্‌গণের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। স্যান্ডিফোর্ড বলেছেন, "কর্মক্ষমতার হ্রাসই হল অবসাদ।" হার্ভে পিটারসন্ বলেছেন, "অতিরিক্ত কাজ করার জন্য কর্মক্ষমতার হ্রাসই হল অবসাদ।" স্ট্যান্ডিফোর্ডের সংজ্ঞা খুবই সীমিত। তিনি যে কোনো ধরনের কর্মক্ষমতার হ্রাসকেই অবসাদ বলেছেন। কিন্তু আধুনিক মনোবিদ্‌গণ যে কোনো ধরনের কর্মক্ষমতার হ্রাসকেই অবসাদ বলেন না। পিটারসনের সংজ্ঞা এদিক থেকে অনেকটা বিশেষধর্মী। তিনি একনাগাড়ে কাজ করার দরুণ আমাদের কর্মক্ষমতার যে অবনতি হয়, তাকেই অবসাদ বলেছেন। অন্য অনেক কারণে আমাদের কাজের ক্ষমতার হ্রাস হতে পারে। যেমন, অসুস্থতার জন্য অনেক সময় আমাদের কর্মক্ষমতা কমে যায়, তাকে আমরা অবসাদ বলব না। মনোবিদ্‌গণ অবসাদকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন — দৈহিক ও মানসিক অবসাদ। খুব বেশি সময় ধরে দৈহিক পরিশ্রম করলে যে অবসাদ আসে, তাকেই দৈহিক অবসাদ বলে। অন্যদিকে মানসিক কাজ অনেকক্ষণ ধরে করলে, মানসিক কর্মক্ষমতা কমতে থাকে এবং অবসাদ দেখা যায়। অনেকক্ষণ ধরে একনাগাড়ে অঙ্ক কষলে বিচারশক্তি, চিন্তাশক্তি, নির্ভুল করার ক্ষমতা সমস্ত দিক থেকে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একেই বলা হয় মানসিক অবসাদ।

একটানা অনেকক্ষণ কাজ করলে আমাদের কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। কর্মপরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ভাবে এই অবসাদ আসবেই। আমরা যতই সুব্যবস্থা করি না কেন, কাজ মানুষের দৈহিক ও মানসিক সহ্যের সীমা অতিরিক্ত হলেই অবসাদ দেখা দেবে। কিন্তু অনেক সময় লক্ষ্য করা গেছে, কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়াই শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবসাদ আসে। আবার, অনেক সময় পরিস্থিতির অবস্থার দরুণও শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবসাদের অনুভূতি দেখা দেয়। শ্রেণিকক্ষে এইসব অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষমতাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানোর জন্য আমরা কতকগুলি কৌশল অবলম্বন করতে পারি। এইসব কৌশলগুলি হল —

i] অবসাদ ও আগ্রহ ঃ—

আগ্রহের [Interest] সঙ্গে অবসাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ থাকে, সে বিষয়ে তারা অনেকক্ষণ একসঙ্গে পড়লেও তাদের সেই কাজের জন্য মানসিক অবসাদ আসে না। আবার যে বিষয়ের প্রতি তাদের আগ্রহ নেই, সেসব বিষয় একটু পড়ার পরই তাদের মধ্যে অবসাদের অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়। তাই শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অযথা অবসাদ দূর করতে হলে পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহই সৃষ্টি করতে হবে।

ii] প্রেষণা ও অবসাদ ঃ—

শ্রেণিকক্ষের অযথা অবসাদকে দূর করতে হলে শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাযোগ্য প্রেষণা [Motivation] জাগ্রত করতে হবে। প্রেষণা ও আগ্রহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি যথাযোগ্য প্রেষণা সৃষ্টি করতে পারলে তারা সহজে অবসাদগ্রস্ত হবে না।

iii] বিরক্তি ও শ্রেণিকক্ষের কাজ ঃ—

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা যেটুকু মানসিক কাজ করে, তার দ্বারা অবসাদ আসতে পারে না। একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন, যান্ত্রিক কাজ বিরক্তির সৃষ্টি করে। পাঠে বৈচিত্র্য আনার জন্য শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক প্রদীপন ব্যবহার করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের কিছু হাতে-কলমে কাজ দিলে বক্তৃতার একঘেয়েমি থেকে তারা মুক্তি পায়।

iv] অবসাদ ও সময় তালিকা ঃ—

যখন শিক্ষার্থীদের মানসিক কাজ করার ক্ষমতা কম থাকে, তখন যদি তাদের খুব কঠিন কিছু বিষয়ে পড়তে দেওয়া হয়, তাহলে তারা তার ফলে খুব দ্রুত অবসাদ্‌গ্রস্ত হবে। আবার একটানা যদি সব কঠিন বিষয়গুলি পড়তে দেওয়া হয়, তাহলে তারা এমনই অবসাদ্‌গ্রস্ত হবে যে, পরবর্তীকালে আর কোনো কাজই তারা করতে পারবে না। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব হবে, বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এমন কাজের তালিকা তৈরি করা, যার ফলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কাজ পাওয়া যায়।

v] বিশ্রাম ও অবসাদ ঃ—

এক নাগাড়ে তিন ঘণ্টা বা চার ঘণ্টা কাজ করার পর 30 মিনিট বিশ্রাম দিলে যে ফল পাওয়া যায়, প্রতি এক ঘণ্টা বা দু'ঘণ্টা অন্তর 10 মিনিট বিশ্রাম দিলে তার চেয়ে বেশি ভালো ফল পাওয়া যায়। তা ছাড়া বিশ্রামের সময় শিক্ষার্থীরা কীভাবে সময় কাটাবে, সে সম্পর্কেও শিক্ষককে চিন্তা করতে হবে। এক কথায় শিক্ষক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবসাদের প্রভাবকে কমানোর জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করবেন এবং বিশ্রাম সময়কালীন আচরণবিধিও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

vi] শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ও অবসাদ ঃ—

শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা, বোর্ডের অবস্থান, শ্রেণিকক্ষের আলো, বাতাস ইত্যাদির ব্যবস্থার দিকে শিক্ষককে নজর দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের অবসাদের অনুভূতি হ্রাসের জন্য সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়ের পরিবেশেরও উন্নতি করতে হবে।

সুতরাং শিক্ষার্থীকে অবসাদের প্রভাবমুক্ত করে তাদের কর্মক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে হলে শিক্ষকের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাব কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের কাজে উৎসাহিত করতে পারেন, তা হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবসাদের অনুভূতি আসবে না। শিক্ষকের সহানুভূতি, নির্দেশনা, উৎসাহ শিক্ষার্থীদের সব সময়েই কাজে অনুপ্রাণিত করবে। অর্থাৎ কর্মের আদর্শ তিনি যদি তাদের সামনে তুলে ধরতে পারেন, তাহলে তাঁর নিজের কাজের অনেক সুবিধা হবে।

অবসাদের সাথে লড়াই করার জন্য সহায়ক কিছু উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। সেগুলি হল —

1. অবসাদ কাটাতে প্রায়ই খান ঃ—

সারাদিন আপনার শক্তি ধরে রাখার জন্য একটি ভাল উপায় হল নিয়মিত খাবার খাওয়া এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া। ঘন ঘন বড় খাবারের পরিবর্তে প্রতি 3 থেকে 4 ঘণ্টা অন্তর খাওয়া।

2. ব্যায়াম করুন ঃ—

নিয়মিত ব্যায়াম করলে আপনি দীর্ঘমেয়াদে কম ক্লান্ত বোধ করবেন। তাই আপনার আরও শক্তি থাকবে। অল্প পরিমাণ ব্যায়াম দিয়ে শুরু করুন। এমনকি একটুমাত্র 15 মিনিটের হাঁটাও আপনার শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। প্রতিদিন অল্প পরিমাণ সাইকেল চালালেও আপনার অবসাদ দূর হতে পারে।

3. ওজন কমান ঃ—

যদি আপনার শরীর অতিরিক্ত ওজন বহন করে তবে এটি ক্লান্তিকর হতে পারে। এটি আপনার হৃদয় যন্ত্রে অতিরিক্ত চাপও রাখে যা আপনাকে ক্লান্ত বা অবসাদগ্রস্ত করে তুলতে পারে। ওজন হ্রাস করুন এবং আপনি অনেক বেশি উদ্যমী বোধ করবেন।

4. ভালো ঘুমোন ঃ—

সারাদিন সক্রিয় থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ঘুমটা ভীষণ দরকার। প্রতিদিন 7 থেকে 8 ঘণ্টা ঘুম আমাদের দরকার। প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমাতে যেতে হবে এবং ঠিক সময়ে উঠতে হবে। দিনের বেলা ঘুম এড়িয়ে চলতে হবে।

5. চাপ কমান ঃ—

অতিরিক্ত চাপ আপনার শরীরে অবসাদ আনতে পারে। তাই কিছু সময় আপনি যোগাসন করুন, একটু গান শুনুন বা কিছু পড়ুন। বন্ধুদের সাথে কিছু সময় কাটালেও আপনার অবসাদ দূর হতে পারে।

6. কথা বলার থেরাপি ঃ—

কথা বলার থেরাপি অবসাদ দূর করতে সাহায্য করে। এমন কিছু প্রমাণ রয়েছে যে, কথা বলার থেরাপি যেমন — Counselling বা Cognitive Behavioural Therapy [CBT] ক্লান্তি বা অবসাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে।

7. ক্যাফিন বাদ দিন ঃ—

ক্যাফিন একটি উদ্দীপক যেটি আপনাকে আরও জাগ্রত করে রাখে। কিন্তু এটি আপনার স্বাভাবিক ঘুমের ছন্দকেও ব্যাহত করতে পারে। যার ফলে ঘুমের সমস্যা এবং দিনের পর দিন ক্লান্তি দেখা দেয়। ক্যাফিন যুক্ত পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে — কফি, চা, ঠাণ্ডা পানীয়, এনার্জি ড্রিঙ্ক, কিছু ব্যাথানাশক এবং ভেষজ প্রতিকার। শরীরে ক্যাফিনের প্রভাব 7 ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে, তাই আপনার ঘুমের সমস্যা হলে আপনি সন্ধ্যায় এটি এড়িয়ে যেতে পারেন। আপনি যদি আপনার খাদ্য থেকে ক্যাফিনকে সম্পূর্ণ রূপে বাদ দিতে চান তাহলে আপনাকে ধীরে ধীরে খাওয়া কমাতে হবে। হঠাৎ বন্ধ করার চেষ্টা করলে অনিদ্রা এবং মাথাব্যথ্যা হতে পারে।

8. জল খান ঃ—

নিজের শরীরকে অবসাদ মুক্ত রাখতে হলে আপনাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করতে হবে। কখনও কখনও আপনি ক্লান্ত বোধ করেন কারণ আপনি হালকা ডিহাইড্রেটেড হয়ে যান। তাই জল পর্যাপ্ত পরিমাণে পান করতে হবে।

তাই নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করুন। অবসাদে ভুগে নিজেকে নেশায় ডুবিয়ে দেবেন না। নিজের হাসির পিছনে মনের কষ্ট লুকিয়ে রাখবেন না, তাকে প্রকাশ করুন। কাউকে বলতে না পারলে অন্তত রোজ ডাইরি লিখুন, তাতেও কিছুটা হালকা হবেন। মনে রাখবেন অবসাদের বিরুদ্ধে এই লড়াই আপনাকে জিততেই হবে। আর যদি জিতে যান তাহলে অন্য কাউকে এই লড়াইটা জিততে সাহায্য করুন।

"শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু।"

— স্বামী বিবেকানন্দ

সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রবল অধ্যবসায়, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই। অধ্যবসায়শীল সাধক বলেন, 'আমি গণ্ডুষে সমুদ্র পান করিব। আমার ইচ্ছামাত্রে পর্বত চূর্ণ হইয়া যাইবে।' এইরূপ তেজ, এইরূপ সঙ্কল্প আশ্রয় করিয়া খুব দৃঢ়ভাবে সাধন কর। নিশ্চয়ই লক্ষ্যে উপনীত হইবে।

— স্বামী বিবেকানন্দ

শিক্ষামূলক ভ্রমণে 'ঘাটশিলা'

সুব্রত জেলে (ছাত্র, বি.এড. দ্বিতীয় বর্ষ)

"ঘাটশিলাতে যাবার পথে ট্রেন-ছুটছে যখন
মায়ের কাছে বাবার কাছে করছি বকম বকম।"

শৈশবের পড়ে আসা কবিতার লাইনগুলির সাথে একাত্ম হয়ে পড়লাম আমাদের মহাবিদ্যালয়ের আয়োজিত ২০২৪ সালের শিক্ষামূলক ভ্রমণের গন্তব্য ঘাটশিলার কথা শুনে। সঙ্গাসুখের আনন্দ উৎসাহ নিয়ে আমরা দুদিনের ভ্রমণ পরিকল্পনা শুরু করলাম। ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের মধ্য বিপুল আনন্দের জোয়ার বয়ে চলল ভ্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে। বিভিন্ন জায়গার নাম প্রস্তাবিত হতে থাকলো, উঠে এলো ডুয়ার্স, ভাইজাক, সুন্দরবন, দীঘা, মন্দারমণি সবশেষে স্যারেরা ঘাটশিলার নাম চূড়ান্ত করলেন। পূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজের অনুমতিতে শিক্ষামূলক ভ্রমণের দিন স্থির করা হলো ৫ ও ৬ আগস্ট। দিন এগানোর সাথে সাথে আমাদের মনের মধ্যেও উৎসাহ বাড়তে শুরু করে, সাথে গুগলে ঘাটশিলা সম্পর্কিত নানা তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা এগোতে থাকে। মনে উৎসাহের জোয়ার ও নানা কল্পনার চিত্রপট অঙ্কিত হতে থাকে এই সময়। আবেগের সাথে কিছু দায়িত্ব নিলাম, সাথে সোমনাথ হালদার, সায়নদীপ জানা, সহিষ্ণু বিশ্বাস। অধ্যাপক সঞ্জয় মিত্র ও অধ্যাপক মিল্টন বিশ্বাস সমগ্র বিষয়টির সমন্বয় করছিলেন। যাওয়ার আগে আমাদের সমস্ত অধ্যাপকবৃন্দ মাননীয় কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, মিল্টন বিশ্বাস ও সঞ্জয় মিত্র শিক্ষামূলক ভ্রমণ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন। শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে কেমন করে আমরা সংঘসুখ ও সঙ্গাসুখ লাভ করতে পারি, এই ভ্রমণ থেকে জীবনের একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে কিভাবে নিজেকে আরো নতুন করে চেনা যায় এবং বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় আমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারি, তা তাঁরা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন। এই কথাগুলিতে আমরা বিশেষভাবে উৎসাহিত হই এবং এই ভ্রমণ থেকে সর্বাধিক আনন্দ লাভ করি।

যাওয়ার আগের দিন অর্থাৎ ৪ঠা আগস্ট আনন্দ উৎসাহের সাথে আমরা প্রস্তুতি নিতে থাকলাম। বৃষ্টি ও ট্রেনের সঠিক সময়ে না ছাড়ার আশঙ্কাতে কিছুটা আতঙ্কিত হলাম বটে কিন্তু প্রস্তুতি তখন তুঙ্গে। টিকিট প্রিন্ট করা থেকে টিফিনের ব্যবস্থা, কিভাবে যাওয়া হবে তার পরিকল্পনা সবই গ্রুপে আসতে থাকল। যাদের দূরে বাড়ি, তারা কয়েকজন হোস্টেলে চলে এলো। অধ্যাপক সঞ্জয় মিত্র ওই রাত্রে হোস্টেলে চলে এলেন। ভোর তিনটে থেকে হোস্টেলে হইচই পড়ে গেল, সঞ্জয় স্যার বাঁশি বাজাতে শুরু করলেন, হোস্টেলের বেল পড়ে গেল, একপ্রকার হই হই রব শুর হয়ে গেল। প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম কারণ হাওড়াতে আমাদের ট্রেনের সময় ছিল সকাল ৬ঃ৩৫ মিনিট। আধোঘুম চেহারায় আমরাও রেডি হয়ে পড়লাম ভোর চারটের সময়। এদিকে সোমনাথ ভোর তিনটের সময় সাইকেলে করে স্বর্ভাণু স্যারকে আনতে গেল। রাকিবুল কৌশিক স্যারকে নিয়ে এলো। আমরা সকলেই খড়দহ স্টেশনে ৪ঃ৪২-এ নৈহাটি শিয়ালদা প্রথম লোকাল ট্রেনের আগেই উপস্থিত

হলাম। ভোর ৫ঃ১০ শে শিয়ালদহে পৌঁছালাম ওখান থেকে বাসে করে হাওড়া স্টেশন। সকাল ৬টার মধ্যে আমরা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। অপেক্ষা করতে থাকলাম আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার সারথি ১২৮৭১ হাওড়া-চক্রধরপুর ইস্পাত এক্সপ্রেসের জন্য। মনে একটা ভয় ছিল আগের দিন প্রায় নির্ধারিত সময়ের তিন ঘণ্টা পর এই ট্রেনটি ছেড়েছিল আজ কি হবে? কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় ঐদিন ট্রেন সময়েই ছাড়ে। আমরা আনন্দের সঙ্গে রওনা হলাম ঘাটশিলার পথে। এইবারে আমাদের সমগ্র যাত্রা পথে ছাত্র-শিক্ষক সম্মিলিতিভাবে আমরা ৫০ জন সহযাত্রী হলাম। অনন্য অভিজ্ঞতা তার সাথে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার আগ্রহ এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কি এক নতুন পর্যায়ে পাওয়ার আনন্দ নিয়ে আমরা এগোতে থাকলাম। ট্রেনের মধ্যে আমাদের সকালের ব্রেকফাস্ট সকলের কাছে পৌঁছে দিল সোমনাথ, সায়নদীপ ও ঋক। ট্রেনের মধ্যেও আধোঘুম চোখে গান, গল্প, মেদিনীপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের মাধ্যমে পৌঁছে গেলাম ঘাটশিলা স্টেশনে সময় সকাল তখন ১০টা।

ঘাটশিলা স্টেশনে পৌঁছে আমরা সম্মিলিতভাবে একটি গ্রুপ ফটো কলেজে ব্যানার নিয়ে ক্যামেরাবন্দি করলাম, তারপর রওনা হলাম হোটেলের দিকে। পূর্বেই ৭টি অটো আমাদের দুদিনের সমগ্র ঘাটশিলা ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য বুক করা ছিল। ওরাই আমাদের স্টেশন থেকে হোটেলের দিকে নিয়ে গেলেন। হোটেলে গিয়ে আমাদের জিনিসপত্র রেখে অল্প সময়ে ফ্রেশ হয়ে আমরা প্রস্তুত হয়ে নিলাম ঘাটশিলা ভ্রমণের জন্য। আমরা সকলেই ১১ঃ১৫ মিনিটের মধ্যে অটোয় করে রওনা হলাম। প্রথমে গিয়ে উপস্থিত হলাম ফুলডুংরি হিলে। আমরা সকলেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লাম। সুন্দর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে আমরা উপরে চড়তে শুরু করলাম। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পাহাড়ের উপর বসে উপন্যাস লিখতেন। সাহিত্যিকের স্মৃতি বিজড়িত এই স্থান দেখে আমরা রওনা হলাম বুরুডি লেকের দিকে। পাহাড় ঘেরা রাস্তা আর ঝাড়খণ্ডের জনজাতিদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করতে করতে আমরা এগিয়ে চল্লাম আমাদের গন্তব্যের দিকে। এইখানে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। বুরুডি লেকে অপূর্ব সৌন্দর্য্যময় পাহাড় ঘেরা একটি বিস্তীর্ণ জলাশয়। আমরা অনেকেই পাহাড়ে উঠার চেষ্টা করলাম, আমরা উৎসাহের সাথে পাহাড়ে উঠে পড়লাম; কিন্তু নামার সময় বিকাশ ও মেহেরুল অসুবিধায় পড়ল, বুকে ভয় নিয়ে ওরা আস্তে আস্তে নেমে এল। সম্রাট স্যার ওদের সাবধানে নামার জন্য পরামর্শ দিয়ে ওদের নামার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। আবার অপরদিকে লেকের জলে বোটিং করা শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমি পাহাড় থেকে নেমে দেখি সঞ্জয় স্যার প্রথম বর্ষের ভাইদের বোটিং করছেন, অপরদিকে মনোরঞ্জন স্যার ও মিল্টন স্যার অপর দুটি বোটে লেক ঘুরে এলেন। বোটিং ও ফটোগ্রাফির মাঝে আমাদের মধ্যাহ্নভোজনের ডাক এসে পড়ল। আমি ও সঞ্জয় বেরার বোটিং করার বড় ইচ্ছা ছিল কিন্তু খাওয়ার আগে সময় ও সুযোগ না থাকায় আমরা তাড়াতাড়ি করে খেয়ে দুজনে বোটিং করতে শুরু করলাম। আমাদের দেখে বিশাল ও বিকাশ বোটিং করতে শুরু করল। পাড় থেকে সঞ্জয় স্যার পরবর্তী গন্তব্যে যাওয়ার জন্য বাঁশির আওয়াজ দিলেন আমরা তাড়াতাড়ি বোটিং শেষ করলাম। রওনা হলাম পরবর্তী গন্তব্য ধারাগিরি জলপ্রপাতের দিকে।

ধারাগিরি পৌঁছে ওখানকার স্থানীয় এক ঠাকুরমার গাইডে আমরা এগিয়ে চললাম ঝরনার দিকে। পাহাড়ি রাস্তায় সাবধানে সবুজ বনের মধ্য দিয়ে পৌঁছে গেলাম ঘাটশিলার বিখ্যাত ধারাগিরি ঝর্ণার কাছে। আমাদের সকলেরই শরীর প্রায় তখন ক্লান্ত; এই ক্লান্ত শরীরকে সতেজ করতে আমরা প্রায় সকলেই নেমে পড়লাম ঝর্ণার জলে। সর্বপ্রথম সৌভিক আমাদের মনে সাহস জুগিয়ে ঝর্ণার জলে নামলো। একে একে উভয় বর্ষের ছাত্ররা নেমে পড়ল ঝর্ণার জলে। এই আনন্দ উপভোগ করবার জন্য সম্রাট স্যার ও মনোরঞ্জন স্যার ঝর্ণার জলে নামলেন। ক্লান্ত শরীরে ঝর্ণার শীতল জল আমাদের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিল। প্রায় আধ ঘণ্টার মতো এই মনোরম পরিবেশ উপভোগ করে মনের মতো স্নান করে আমরা উঠে এলাম। এরপর আমরা রওনা হলাম চিত্রকুট পাহাড়ের দিকে। বেলা তখন পড়ে এসেছে চিত্রকুট পাহাড় থেকে সমগ্র ঘাটশিলার যেন অনন্য মাধুর্য প্রকাশ পাচ্ছিল। ঘাটশিলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই পাহাড় থেকে পরিলক্ষিত হয়। একদিকে পাহাড়ের উঁচু ঢিপি; অপরদিকে শহরের ঘরবাড়ি রেলপথ। এখান থেকে অস্তগামী সূর্যের দৃশ্যটি সত্যিই মনোমুগ্ধকর। উপরে মহাদেবের একটি মন্দির রয়েছে যেখানে নিত্য পূজিত হন মহাদেব। আমরা বাবার আশীর্বাদ নিয়ে এই পাহাড়ের সুন্দর দৃশ্যগুলিকে ক্যামেরাবন্দি করলাম। বেশ কিছুক্ষণ এই সুন্দর পরিবেশে সময় কাটিয়ে রওনা হলাম পরবর্তী গন্তব্যের দিকে। পড়ন্ত বিকেলে আমরা গিয়ে পৌঁছালাম সুবর্ণরেখা নদীর ধারে। সুবর্ণরেখার শীতল বাতাস ও রক্ত বর্ণের মতো সূর্য আমাদের মনে বিশেষ শান্তি প্রদান করলো। সুবর্ণরেখার ঘাটে দাঁড়িয়ে আমরা সমবেতভাবে এই সুন্দর মুহূর্তকে ক্যামেরা বন্দি করলাম। এরপর ঘাটশিলাই অবস্থিত রঙ্কিনি মন্দিরে পৌঁছালাম। সেখানে গিয়ে আমরা মায়ের কাছে একটি সমবেত গান ধরলাম, যার মাধ্যমে আমাদের সমস্ত দিনের ক্লান্তি যেন এক মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল। সায়নদীপ রামকৃষ্ণ সংঘের একটি জনপ্রিয় গান "একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে। তোমার ভুবন-ভরা রূপটি একবার দেখে লই মা নয়নে।" অপূর্ব মাতৃশক্তি যেন আমাদের হৃদয়ে শান্তির বলয় সৃষ্টি করল। গান শেষ করে ভাবাবেগ সঙ্গে নিয়ে আমরা হোটেলের দিকে ফিরে এলাম।

হোটেলে ফিরে সারাদিনের ক্লান্ত শরীর একটু শীতল করবার জন্য আমরা সকলেই ফ্রেশ হয়ে নিলাম। তারপর আমাদের প্রত্যেকের রুমে সন্ধ্যার চা ও বেকারি বিস্কুট পৌঁছে গেল; যাতে শরীরটা একটু সতেজ হলো। কৌশিক স্যারের জ্বর ও ঠান্ডা লাগায় উনি আগেরবারের মতো আনন্দ করতে পারছিলেন না। স্যার বিশ্রাম করলেন হোটেলে, আমরা রওনা হলাম পাশেই অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠের উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যারাত্রিক সবে শেষ হয়েছে আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম। এখানে ঠাকুরের খুব সুন্দর বিগ্রহ রয়েছে, আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজ আমাদের সাথে কথা বললেন। সঞ্জয় স্যার সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে মহারাজকে জানালেন। মহারাজ ভীষণ খুশি হলেন এবং আমাদেরকে এক প্যাকেট চকলেট উপহার দিলেন। এরপর মহারাজ আমাদের কাছ থেকে ঠাকুরের কিছু গান শুনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমরাও তড়িঘড়ি বসে পড়লাম ঠাকুরের গান শোনাবার জন্য। আমাদের সাথে গিয়েছিলেন আমাদের হোস্টেলের সংগীতের শিক্ষক স্বর্ভাণু পাল। ছাত্র-শিক্ষক সমবেতভাবে পাঁচটি গান গাওয়া হলো। সারাদিনের ক্লান্তি যেন নিমেষে দূর হয়ে গেল অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যে। গান শেষে অধ্যক্ষ মহারাজ আমাদের জন্য মিষ্টি, বিস্কুটের প্যাকেট ও আইসক্রিমের

ব্যবস্থা করেছেন। আমরাও হাতে পেয়ে আনন্দের সাথে খেতে খেতে পাশেই একটি মেলা বসেছিল সেই দিকে সকলে অগ্রসর হলাম। পাহাড় ঘেরা এলাকার মধ্যে সুন্দর একটি মেলা দেখে বাংলার সাথে তেমন কিছুই পার্থক্য পেলাম না। মেলাতে অনেক কিছু কেনাকাটা করা হলো। অধ্যাপক মিলটন বিশ্বাস ও অধ্যাপক তুষার কান্তি হালদার দুজনেই বাড়ির জন্য কেনাকাটা করলেন। অপরদিকে আমাদের সহপাঠী অনুপ পাঁজা ও সৌরভ ঘোষ হাজরা নাগরদোলাই উঠে হাত-পা ঠাণ্ডা করে নেমে এসেছে। প্রথম বর্ষের ভাইরা মেলায় ঘোরাঘুরি কেনাকাটা করতে আরম্ভ করল। আমরাও ফুচকা খেয়ে হোটেলের দিকে ফিরে এলাম। হোটেলে ফিরে একটু রেস্ট করলাম। তারই মধ্যে রাত্রের ডিনারের রুটি সাথে চিকেন কষা প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। আমরা একসাথে আনন্দের সাথে রুটি-মাংস খেলাম। খাওয়া দাওয়ার পর ইচ্ছা ছিল একটা গানের আসর বসানোর কিন্তু পাহাড়ি রাস্তার যে জার্নির ধকল আমরা প্রায় সকলেই ক্লান্ত ছিলাম; ফলে আমরা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। তবু বন্ধুদের মধ্যে নানা গল্প গুজব লেগেই থাকলো। বিশেষ করে মিমিক্রি আরো কত কি এই ভাবেই আমাদের প্রথম দিনের যাত্রা শেষ হল।

পরের দিন ৬ই আগস্ট আমরা সকাল সকাল রেডি হয়ে নিলাম ঘাটশিলার দর্শনীয় স্থানগুলির উপভোগ এবং উপলব্ধি করবার জন্য। সকাল সাতটার মধ্যে আমাদের অটো হোটেলের সামনে এসে উপস্থিত। আমরা সকলেই স্নান করে রওনা হলাম; কারণ ফিরে এসে হোটেলে খেয়ে আজই আমাদের ফেরার ট্রেন। সকাল ৭ঃ৩০ নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লাম প্রথমে রামকৃষ্ণ মঠ, ঘাটশিলার সামনে গিয়ে একটি গ্রুপ ফটো নিলাম। তারপর স্টেশনের পাশেই একটি হোটেলে আমাদের সকালের ব্রেকফাস্টের অর্ডার দেওয়া ছিল সেখানে গিয়ে লুচি সাথে আলুর তরকারি দিয়ে আমরা ব্রেকফাস্ট সারলাম। তারপর আমরা রওনা হলাম সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। সাহিত্যিকের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি দেখে আমরা আপ্লুত হয়ে পড়লাম। প্রথম বর্ষের ভাইরা অধ্যাপক কৌশিক চট্টোপাধ্যায়কে সাহিত্যের বিষয় নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করল। স্যার প্রাণবন্তভাবে তার উত্তর দিলেন। এখানে সাহিতিক্যের ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ ও চিঠিপত্র সুন্দরভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। সাহিত্যিকের বাড়িতেই বাচ্চাদের জন্য বিনামূল্যে 'অপুর পাঠশালা' রয়েছে। এখান থেকে দুঃস্থ শিশুদের শিক্ষা দান করা হয়। বাড়ির দেওয়ালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা চিত্র ও নিচে বর্ণনা আকারে সুন্দরভাবে দেওয়া রয়েছে। সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যাতে আম খেতে পারেন তার জন্য তাঁর ভাইয়ের লাগানো এই প্রাচীন আম গাছের অংশবিশেষ রয়েছে সংরক্ষণ আকারে। আমরা স্থানটি দেখতে দেখতে 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'চাঁদের পাহাড়' বিভিন্ন উপন্যাসের ঘটনাবলি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আমরা সম্মিলিতভাবে একটি গ্রুপ ফটো তুলে ও সাহিত্যিকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

এরপর আমরা রওনা হলাম সুবর্ণরেখার রিভার সাইডে। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে ভগ্নপ্রায় একটি বাঁধ তার পাশে অপূর্ব একটি ঝর্ণা। নদীতে গ্রামবাসীরা জাল ফেলে মাছ ধরছে। বর্ষাকাল হওয়ার জন্য সুবর্ণরেখার জল এখন অনেক বেশি। আর এই ভগ্নপ্রায় বাঁধে লাগানো ক্যালভাট দিয়ে সশব্দে প্রবল জলস্রোত বয়ে চলেছে। আমরা প্রাকৃতিক এই সৌন্দর্য উপভোগ করে ঝর্ণার দিকে এগিয়ে গেলাম। ওখানের ঝর্ণাটি একটু

ভেতরে হওয়ার জন্য কৌশিক স্যার যেতে পারেননি; তাই স্যারকে অনুরোধ করলাম এই ঝর্ণাটি দেখতে যাওয়ার জন্য। স্যার আমাদের কথা রেখে ঝর্ণাটি দেখতে এগিয়ে গেলেন। আমরাও ঝর্ণাটি দেখে নিজের মত কিছু ছবি তুললাম। সোমনাথ, শুভ্রকান্তি, বিজয়, স্নেহাশীষ ঝর্ণার কাছে গিয়ে ছবি তুলে নিলাম। সুবর্ণরেখা নদীর ধার ও ঝর্ণার মনোরম পরিবেশ দেখে আমরা রওনা হলাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের দিকে। এরপর আমরা রওনা হলাম সিদ্ধেশ্বর হিলের দিকে। সিদ্ধেশ্বর হিল ঘাটশিলার অন্যতম প্রসিদ্ধ পাহাড়। সুন্দর পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম প্রায় ৬০০ মিটার পাহাড়ে উঠতে হলো আমাদের। আমরা সাবধানে স্যারদের সাথে গল্প করতে করতে পৌঁছে গেলাম সিদ্ধেশ্বর হিলে। সেখানে প্রাচীন একটি শিবলিঙ্গ রয়েছে; যদিও বর্তমান সময়ে একটি নতুন মন্দির নির্মিত হয়েছে। মহাদেবের নিত্য পূজা সেখানে হয়ে থাকে স্থানীয় মানুষও পুজো দিতে আসেন। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম দেখলাম দুটি পরিবার পুজো দিতে এসেছেন। আমরাও মহাদেবকে প্রণাম করে আমি, স্বর্ভাণু স্যার, মানস ও ঋক সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মাথায় জল ঢাললাম। এখান থেকে দূর-দূরান্তের পাহাড়ের চূড়াগুলি এক অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। আমাদের বন্ধুরা সব বিভিন্ন ভাবে এই মুহূর্তগুলিকে ক্যামেরাবন্দি করতে শুরু করল। আমরাও আমাদের মহাবিদ্যালয়ের ব্যানার নিয়ে এই পাহাড়ের সুন্দর মুগ্ধকর পরিবেশকে ক্যামেরা বন্দি করলাম। এত কষ্ট করে পাহাড়ে ওঠার যে ক্লান্তি তা যেন এক নিমিষেই দূর হয়ে গেল এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে। অধ্যাপক তুষার কান্তি হালদার, অধ্যাপক সঞ্জয় মিত্র, অধ্যাপক সম্রাট বিষয়, অধ্যাপক মিন্টন বিশ্বাস সকলেই আমাদের সাথে তাল মিলিয়ে এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলেন। এরপর সাবধানে আমরা পাহাড় থেকে নেমে এলাম। নামার পথে একটি দোকান থেকে একটু কোল্ডড্রিঙ্কস খেলাম। মিলটন স্যার এই পাহাড়ের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করলেন। আমরা পরবর্তী গন্তব্যের দিকে রওনা হওয়ার জন্য অটোর কাছে রওনা হলাম। আমাদের শরীর এখন ক্লান্ত কিন্তু মনে উৎসাহ অনন্ত তাই আমরা রওনা হলাম পরবর্তী গন্তব্যের দিকে।

পাহাড় ঘেরা রাস্তায় গান গল্প হতে হতে পৌঁছে গেলাম মালব রঙ্কিনি উপজাতির অধীশ্বরী দেবী রঙ্কিনি মন্দির-এর দিকে। মন্দিরে পৌঁছানোর আগে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'রঙ্কিনি দেবীর খাড়া' সানডে সাসপেন্স শোনা, এই গল্পের কথা মনে হতে লাগলো ও মন রোমাঞ্চিত হতে লাগলো। কথিত আছে এই মন্দিরে নরবলি দেওয়া হতো। মালব রাজারা এই মন্দিরকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন এবং শোনা যায় যে বছর বলি দেওয়া হতো না সে বছর মায়ের খাড়া দিয়ে রক্ত ঝরে পড়তো। রক্ত ঝরে পড়লেই রাজ্যে মহামারী, দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। ইতিহাসের এই পৌরাণিক ঘটনাগুলি মনে করতে করতে আমরা মায়ের মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। রাস্তার উপর সুন্দর মন্দির, বন্ধুরা অনেকেই মায়ের কাছে পুজো দিল, আমি মায়ের কাছে প্রণাম করতেই পুরোহিত মশাই আমার হাতে একটি প্রসাদ তুলে দিলেন। প্রসাদ খেয়ে আমি মায়ের সেই খাড়াটি অনুসন্ধান করতে শুরু করলাম কিন্তু সফল হলাম না। এরই মধ্যে সঞ্জয় স্যারের বাঁশির আওয়াজ কানে পৌঁছল। মায়ের কাছে সকলের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করে আমরা পরবর্তী গন্তব্যের দিকে রওনা হওয়ার জন্য গাড়িটির দিকে এগিয়ে গেলাম। এরপর গাড়িতে উঠে আজকের আমাদের শেষ গন্তব্যের দিকে আমরা এগোলাম গালুড্রি ব্যারেজ। যেহেতু সুবর্ণরেখার জল সারা বছর থাকে না তাই এই ব্যারেজের মাধ্যমে জল

সঞ্চয় করে ক্যানেল এর মাধ্যমে ঘাটশিলার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হয়। যার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষরা কৃষিকাজ করে থাকেন। ব্যারেজ থেকে সুবর্ণরেখা নদী ও ঘাটশিলাতে অনবদ্য সৌন্দর্য্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। এত উঁচু ব্যারেজ থেকে জাল ফেলে মাছ ধরার দৃশ্যটি আমাদের কাছে একটি বাড়তি পাওনা। আমরা সকলেই গিয়ে লক্ষ্য করলাম কিভাবে স্থানীয় মানুষরা মাছ ধরছিলেন এবং আমারা অনেকেই এই জায়গাটিকে ক্যামেরাবন্দি করলাম যদিও হাতে সময় বেশি না থাকায় আমরা তাড়াতাড়ি রওনা হলাম হোটেলের দিকে। হোটেলে গিয়ে আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে আমাদের খাওয়ার হোটেলের দিকে রওনা হলাম। ঝাড়খণ্ডের দেশি মুরগির মাংস দিয়ে ভাত খেয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম স্টেশনে। ট্রেন লেট থাকায় স্টেশনে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। নির্ধারিত সময়ের প্রায় দেড় ঘণ্টা পর ট্রেন এসে উপস্থিত হল ঘাটশিলা স্টেশনে। আমরা সকলেই ক্লান্ত শরীরে ভারাক্রান্ত মনে একরাশ মধুর স্মৃতি নিয়ে ঘাটশিলাকে বিদায় জানিয়ে ট্রেনে উঠলাম। যাত্রাপথের একঘেয়েমি দূর করবার জন্য আমরা নিজের মতো করে কিছু গান করতে করতে বৃষ্টি ভেজা রাস্তা উপভোগের মাধ্যমে পৌঁছে গেলাম হাওড়া স্টেশন। হাওড়া থেকে বিভিন্নভাবে আমরা রওনা হলাম আমাদের বাড়ির দিকে। যারা আমরা হোস্টেলে ছিলাম আমরা অনেকে মেট্রোরেল ধরে গঙ্গার নিচে দিয়ে দমদম, দমদম থেকে ট্রেন ধরে খড়দহ পৌঁছালাম। অধ্যাপক সঞ্জয় মিত্র শিয়ালদা থেকে শান্তিপুরের শেষ ট্রেন ধরে রাত প্রায় বারোটা নাগাদ বাড়ি পৌঁছেলেন। এই ভাবেই আনন্দের মাধ্যমে একঘেয়েমি দূর করে একরাশ স্মৃতি নিয়ে আমাদের ২০২৪ সালের মহাবিদ্যালয় শিক্ষামূলক ভ্রমণ শেষ হলো।

এই সমগ্র ভ্রমণ থেকে আমরা যে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয় বিশেষভাবে উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ করলাম, তারমধ্যে অন্যতম সঙ্ঘবদ্ধতা ও সঙ্গাসুখ। দায়িত্বশীলতা ও দায়বদ্ধতা আমরা উপলব্ধি করলাম প্রতি পদে পদে। এরই সাথে শিখলাম সকলকে নিয়ে চলবার দৃঢ়তা ও আনন্দ। নেতৃত্বের গুরুত্ব ও গুণাবলী দায়বদ্ধতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করলাম। কৌশিক স্যারের ভ্রমণে যাওয়ার আগে থেকেই জ্বর ও ঠাণ্ডা লেগে ছিল তবুও আমাদের প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতার জন্য ওই কষ্ট সহ্য করেও আমাদের সাথে প্রতি পদে তাল মিলিয়েছেন। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ক্লাসরুমের বাইরে একটা অন্য মাত্রায় গিয়ে ধরা দিল। সাধারণত প্রত্যহ জীবনের এই চাপে যা ধরা পড়ে না। আমাদের এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের এই শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আমাদের জীবনের জন্য চিরস্মরণীয় ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। যা ভবিষ্যতে উদার মানসিকতা ও সঙ্গা সুখের আনন্দ বিজড়িত এক উন্নত জীবন গঠনে সাহায্য করবে। সঙ্ঘবদ্ধতার যে শক্তি বা ভালোবাসার যে প্রবাহ তা এই ভ্রমণটি আয়োজিত না হলে আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম না। আশা করি আমরা যারা গিয়েছিলাম আমাদের স্মৃতির পাতায় এই সুন্দর মুহূর্তগুলি চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে সারাজীবন।

Swami Vivekananda's Notion of Womanhood

Swami Nirishananda (Principal [Actg.])

Masculinity & Femininity :

The difference at the physical level between man and woman is created with a purpose by nature itself. In the grand scheme of nature Man represents the divine masculine energy and woman the feminine. No one is to be neglected; and both are equally important and respectable. The ideal human society is that society where every man respects every woman and vice-versa. The ideal state in a human society can never be ensured by making some constitutional rights for women or through prioritising Feminism in the Country. The equality between man and woman can never be found in physique but in the Soul. From the perspective of physical structure, man and woman both have some advantages as well as some disadvantages. Fullness can only be realized in the Soul and not in body or mind. That fullness is defined by Swami Vivekananda, popularly known as Swamiji, as the manifestation of the Perfection or Divinity already within the human being, and that manifestation will only be possible by true education or true religion. Thus, moral and spiritual education can help us make an ideal human society where every human being will have honesty, dignity and character in true sense.

Masculinity in men (male) and Femininity in women (female) are bestowed on them by nature as both are equally important and needed in the Society. Man representing masculinity serves the society as the provider and protector whereas Woman representing femininity serves the society as carer and nurturer. If anyone of them is conspicuously absent, the society will surely suffer from incompleteness and if both of them provide the same items on a table, then who will bring the other important necessary stuffs on the table?

A balanced and better equipoised person - man or woman - has both masculine and feminine traits. A judicious combination of masculine and feminine traits is always important for preserving the cosmic calmness as well as restoring equanimity and peacefulness of society. Thus man and woman have equal importance in every aspect in the world and both have important role and responsibility to preserve this divine creation of God.

The theory of Shiva & Shakti :

Each man is the embodiment of divine masculine energy of nature (SHIVA in one sect of Hinduism) and each woman is the embodiment of divine feminine energy of nature

(SHAKTI / Parvati / Gauri in Shaivism). Lord Shiva is well aware of the divine nature of Mata Parvati and how to respect Her. Similarly, Mata Parvati also knows well about Shiva and how to show veneration to Him. When Man and Woman will be capable to respect each other in the Society, then only the ideal human kingdom will be established in this World.

Lord Shiva and Mata Parvati know very well about the real and divine nature of Hara-Gauri. Thus, they always respect each other. In this context Swamiji asserts-

- The principal reason why your race has so much degenerated is that you have no respect for these living images of Shakti.
- Without Shakti (power) there is no regeneration for the world. Why is it that our country is the weakest and most backward of all countries ? — Because Shakti is held in dishonour here.

The idea of perfect equality :

Human beings are classified into *men* (male) and *women* (female) according to the law of nature for procreation and sustenance of life like many other species on the earth. Man and Woman are, as it were, the two wings of a bird, symbolizing our society; nor can it soar if one wing is weakened. Despite being equal in every aspect, women have suffered for aeons under the oppressive rule of their tyrannical lords called as 'men'.

In *Shvetâshvatara Upanishad* it is depicted, "Thou art the woman, Thou art the man, Thou art the boy and the girl as well."

Some excerpts from Swamiji's speeches are given here below just to highlight his (Swamiji) notion of equality -

- We should not think that we are men and women, but only that we are human beings, born to cherish and to help one another.
- Is there any sex-distinction in the Atman (Self)? Out with the differentiation between man and woman - all is Atman!
- No Hindu can be a priest until he is married, the idea being that a single man is only half a man, and imperfect. The idea of perfect womanhood is perfect independence.
- The great Aryans, Buddha among the rest, have always put woman in an equal position with man. For them sex in religion did not exist. In the Vedas and Upanishads, women taught the highest truths and received the same veneration as men. … In what scriptures do you find statements that women are not competent for knowledge and devotion?
- Not until you learn to ignore the question of sex and to meet on a ground of common humanity will your women really develop.

From these statements it is evident that Swamiji's vision of womanhood goes beyond traditional boundaries, emphasizing the inherent divinity and equality of all beings. He believed that the true progress of the society depends on the upliftment of respect to the women, for only then can humanity reach its highest potential. By transcending gender distinctions and embracing our shared humanity, we move closer to the ideal of a compassionate world.

The reason for degeneration of our society :

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।

--मनुस्मृति [*Manu Smriti (3.56)*]

Swamiji understood that the day India had started neglecting their women, the downfall of the nation started. Swamiji reminds us again and again -

- Women are a power, only now it is more for evil because man oppresses woman.
- In India there are two great evils: Trampling on the women, and grinding the poor through caste restrictions.
- You, the men, are educating yourselves to develop your manhood, but what are you doing to educate and advance those who share all your happiness and misery, who lay down their lives to serve you in your homes?
- If the condition of woman is not improved, there will be no chance for the welfare of the world.
- That country and that nation which do not respect women have never become great, nor will ever be in future.

Continuing in the same vein, Swamiji unhesitatingly declared that the decline of society began with the neglect, disregard, dishonour and oppression of women. He believed, by respecting and empowering women, the regeneration and progress of the society will be possible. Weakening of the societal values and injustice are the key factors of the nation's backwardness.

The way to upgrading our society :

If women are honoured and respected by everyone in the society and their condition are improved, our society will be upgraded and developed automatically. Swamiji's vision can be depicted here with the following utterances :

- If one is not allowed to become a lion, he / she will become a fox. Woman is the fox now, but when she is no longer oppressed, she will become the lion.

- Can you better the condition of your women? Then there will be hope for your well-being. Otherwise, you will remain as backward as you are now.
- All nations have attained greatness by paying proper respect to women.
- A race must first cultivate a great respect for motherhood, through the sanctification and inviolability of marriage, before it can attain to the ideal of perfect chastity.
- Eternal, unquestioning self-surrender to Mother alone can give us peace. Love Her for Herself, without fear or favour. Love Her because you are Her child. … Only resting in Mother are we safe.

The ideal of womanhood :

To Swami Vivekananda, the ideal of womanhood in India is lies in chastity and motherhood. Swamiji beautifully expressed his idea of womanhood in his famous adages which are enlisted here below :

- The central idea of the life of a modern Hindu lady is her chastity. The wife is the centre of a circle, the fixity of which depends upon her chastity.
- Every girl in India must aspire to be like Savitri, whose love could not be conquered by death, and who through this tremendous love snatched back from even Yama, the soul of her husband.
- Sita is the name in India for everything that is good, pure, and holy; everything that in woman we call woman. Sita - the patient, all-suffering, ever-faithful, ever-pure wife! Through all the suffering she had, there was not one harsh word against Rama. Sita never returned injury. "Be Sita!" Sita - the pure, the all-suffering! Sita was chastity herself; she would never touch the body of another man than that of her husband.
- The highest of all feminine types in India is mother, higher than wife. Wife and children may desert a man, but his mother never.
- The ideal womanhood of India is motherhood – that marvellous, unselfish, all suffering, ever-forgiving mother. The mother is the highest ideal of womanhood in India.
- She [a woman] must imitate the life of the mother; that is her duty.

Distinctiveness of womanhood :

Womanhood is a distinctive feature in the creation which is mostly manifested in a woman. If both men and women feel it in the core of their hearts, every woman will duly be regarded and honoured in the society and the society will try to protect those special qualities in women at any cost. Thus Swamiji reiterates -

- The Hindu women are very spiritual and very religious, perhaps more so than any other women in the world. If we can preserve these beautiful characteristics and at the same time develop the intellects of our women, the Hindu woman of the future will be the ideal woman of the world.

- The one thing that fulfils womanhood is womanliness in woman and motherhood in them.The mother is the ideal of love; she rules the family; she possesses the family.

- "Many children have been wicked, but there never was a wicked mother" — so says the great saint Ramprasad.

Women should be conscious about their womanhood :

It is really surprising that women themselves are unconscious of their womanhood and forget the ideal of womanhood. Most of the times, it is found that women enjoy beautiful compliments from men towards themselves and as a result, they burst into tears when men behave improperly with them. On the contrary, when they become unruly and aggressive towards men, men are forced to plunge themselves into unfathomable agony by the women folk. As women themselves are not aware about their womanhood, the situation remains unchanged.

According to Swamiji, women have to be conscious first about the ideal of womanhood residing in themselves. Swamiji remarks -

- Men bow low and offer a chair, but in another breath, they offer compliments. They say, 'Oh, madam, how beautiful are your eyes!' What right have they to do this? How dare a man venture so far, and how can you women permit it? Such things develop the less noble side of humanity.

- Unruly women from whose minds the words bear and forbear are gone for ever, and whose false ideas of independence lead them to think that men should be at their feet, and who begin to howl as soon as men dare to say anything to them which they do not like — such women are becoming the bane of the world, and it is a wonder that they do not drive half the men in it to commit suicide. In this way things should not go on. Life is not so easy as they believe it to be; it is a more serious business!

- A good, chaste wife, who thinks of every other man except her own husband as her child and has the attitude of a mother towards all men, will grow so great in the power of her purity that there cannot be a single man, however brutal, who will not breathe an atmosphere of holiness in her presence.

- The position of the mother is the highest in the world, as it is the one place in which to learn and exercise the greatest unselfishness. The love of God is the only love that is higher than a mother's love; all others are lower. It is the duty of the mother to think of her children first and then of herself.

Women can solve their problems themselves :

This is very true that a man can never understand woman's mind as well as their problems also. If women are educated, only they will be able to find out the solutions to their own problems. That's why Swamiji declares -

- Our part of the duty lies in imparting true education to all men and women in society. As an outcome of that education, they will of themselves be able to know what is good for them and what is bad, and will spontaneously eschew the latter. It will not be then necessary to pull down or set up anything in society by coercion.
- Educate your women first and leave them to themselves; then they will tell you what reforms are necessary for them. In matters concerning them, who are you?
- Liberty is the first condition of growth. It is wrong, a thousand times wrong, if any of you dares to say, "I will work out the salvation of this woman or child." I am asked again and again, what I think of the widow problem and what I think of the woman question. Let me answer once for all – am I a widow that you ask me that nonsense? Am I a woman that you ask me that question again and again? Who are you to solve women's problems? Are you the Lord God that you should rule over every widow and every woman? Hands off! They will solve their own problems.
- The natural ambition of woman is through marriage to climb up, leaning upon a man; but those days are gone. Woman shall be great without the help of any man, just as she is.
- Our right of interference is limited entirely to giving education. Women must be put in a position to solve their own problems in their own way. No one can or ought to do this for them. And our Indian women are capable of doing it as any in the world.
- Women will work out their own destinies – much better, too, than men can ever do for them. All the mischief to women has come because men undertook to shape the destiny of women.

'Women Education' is the need of the hour :

According to Swamiji, a nation's progress is inextricably linked to the education of its women folk. Without educating women, societal improvement remains ever elusive. Thus, prioritizing women education will ensure national growth and inclusive development. Swamiji aptly observes -

- There is no hope of rise for that family or country where there is no estimation of women, where they live in sadness.
- Know for certain that absolutely nothing can be done to improve the state of things, unless there is spread of education first among the women and the masses.
- The best thermometer to the progress of a nation is its treatment of its women. … Our right of interference is limited entirely to **giving education**.
- They [Indian women] have many and grave problems, but none that are not to be solved by that magic word 'education'.
- Through education she will not only improve herself but will be able to help others.

Character building education for women :

Character building education focuses on fostering chastity and strength in women. Swamiji put emphasis on true education for women which must nurture moral values and respect for national ideals, ensuring women empowerment to uphold their life-principles and contribute positively to the society. In an affirming tone Swamiji reiterates -

- Now, first of all, intensify that **ideal** within them above everything else, so that they may develop a strong character by the force of which, in every stage of their life, whether married, or single if they prefer to remain so, they will not be in the least afraid even to give up their lives rather than flinch an inch from their **chastity**.
- I should very much like our women to have your intellectuality, but not if it must be at the cost of purity.
- There can never be any sound education of the Indian woman which does not begin and end in exaltation of the national ideals of womanhood, as embodied in her own history and heroic literature.

Aims and objectives of women education :

Women Education is mandatorily needed for the implementation of women empowerment in the society. If women are neglected and left behind, then our society will be half-developed and remaining half portion will remain weak. If the Country is to

progress to its fullest potentials, then men and women both have to be moulded by the man making and character building education prescribed by Swamiji. In this context we can quote :

- Education is the panacea of all social evils.
- For if they get the right sort of education, they may well turn out to be the ideal women in the world.
- For if the physique of the parents be not strong and healthy, how can strong and healthy children be born at all? Married a little later and bred in culture, our mothers will give birth to children who would be able to achieve real good of the country. The reason why you have so many widows in every home lies here, in this custom of early marriage. If the number of early marriages declines, that of widows is bound to follow suit.

Women education system / management :

Swami Vivekananda stressed on the importance of an education system for women which would be rooted in ancient Indian traditions. When Swamiji's disciple Shri Sharat Chandra Chakravarty said to Swamiji "… Sir, just see how many schools and colleges have sprung up nowadays for our women, and how many of them are getting degrees of B.A. and M.A.", Swamiji replied –

- But all that is in the Western style. How many schools have been started on your own national lines, in the spirit of your own religious ordinances? But alas, such a system does not obtain even among the males of your country, what to speak of females!
- I have it in my mind to train up some Brahmacharis and Brahmacharinis, the former of whom will eventually take the vow of Sannyasa and try to carry the light of education among the masses, from village to village, throughout the country, while the latter will do the same among women. But the whole work must be done in the style of our own country. Just as centres have to be started for men, so also centres have to be started for teaching women. Brahmacharinis of education and character should take up the task of teaching at these different centres.
- We must see to their growing up as ideal matrons of home in time. The children of such mothers will make further progress in the virtues that distinguish themselves. It is only in the homes of educated and pious mothers that great men are born.
- It is good to avoid in this country, any association of men with women's schools.
- The duty of teaching in the school ought to devolve in every respect on educated widows and Brahmacharinis.

Curriculum of women education :

A comprehensive curriculum for women education should blend history, ethics, and practical skills with modern science. It should focus on character building, essential life skills development, and spiritual growth while presenting role models from history to inspire and guide women in leading a meaningful life. Swamiji's quotations related to the curriculum of women education are as follows:

- History and the Puranas, house-keeping and the arts, the duties of home-life and principles that make for the development of an ideal character, have to be taught with the help of modern science, and the female students must be trained up in ethical and spiritual life.
- Religion, arts, science, house-keeping, cooking, sewing, hygiene - the simple essential points in these subjects ought to be taught to our women. It is not good to let them touch novels and fiction. The Mahakali Pathshala (established by Tapaswini Mataji) is to a great extent moving in the right direction. But only teaching rites of worship won't do; their education must be an eye-opener in all matters. Ideal characters must always be presented before the view of the girls to imbue them with a devotion to lofty principles of selflessness. The noble examples of Sita, Savitri, Damayanti, Lilavati, Khana, and Mira should be brought home to their minds and they should be inspired to mould their own lives in the light of these.

Conclusion :

In fine, this, no doubt, is a radical interpretation of femininity and womanhood by Swamiji the great thinker. It is needless to say that Swamiji was much ahead of his contemporaries, and what he thought more than hundred years ago, the world is now pondering over. His observations and messages about womanhood and its education system are still relevant for today. Not only that, His reflections on various social issues act as a beacon light to comprehend and find out amicable solutions to some burning problems of the world in the 21st century, such as masculinity and femininity, womanhood and gender, equality between man and woman, and finally the way to attaining a society where both men and women can live together with mutual respect to each other. As a sage deeply rooted in Indian tradition, he defines and explains masculinity & femininity in terms of Shiva-Shakti paradigm delineated in our ancient Shastras and he also justifies his notion of equality from that perspective.

Source : *The Complete Works of Swami Vivekananda.*

True Freedom

Shubhajit Mondal [Student, B.Ed. 1st Year]

Beyond Borders and boundaries of Freedom :-

In life, freedom is more than just living in a free country. It's like a big, complicated idea that goes beyond simple things. Living in a place where we can freely express ourselves is a starting point, but real freedom is like a precious gem with many sides. Each side adds something special to how we see and feel freedom. It's not just about rules and politics; it's about being ourself and making choices that matter. So, freedom is like a colorful and detailed picture that gets richer as we understand it more. It's a big idea that goes beyond borders and boundaries, making life more interesting.

The Canvas of True Freedom :-

At its fundamental level, living in a free country provides individuals with a canvas, an external space where they can openly express themselves. This external freedom is similar to the base layer of a painting, building the foundation upon which the colors of individual expression can be added. It grants individuals the freedom to voice their opinions, move about in their life without constraints, and engage in various activities without fear of harm.

However, true freedom extends beyond these external circumstances. It invites individuals to go beyond the prescribed roles and expectations of society, to delve into the depths of their own authenticity. It can transform a mere background into a vibrant masterpiece, with each stroke representing an individual's self-expression.

The Dynamic Journey of Freedom :-

Freedom is like an ongoing journey where people learn about themselves and adjust to new things. Life is like an adventure, and freedom is like a compass showing us the way through places we have never been to. Even though where we start might be influenced by things outside but what really matters is the choice we make as we go. It's like a traveler exploring different landscapes. He gets to decide which path to take, how to travel, and where to go. That's the true spirit of freedom. It's not just about the borders of a free country; it's about having the freedom to make our own decision and set our own path in life. That's what true freedom is all about.

The Simple Beauty of Everyday Freedom :-

Freedom is really just about making choices that match what we care about and want. Freedom is the power to decide what's best for us, without being forced by others.

It is like the regular choices we make every day that add color to our life. It's like picking what we enjoy and what makes us happy without someone telling us what to do. That's the basic and the best part of freedom, making choices that fit who we are.

For many, freedom becomes a means of escape from the routine, a liberation from the monotonous ticking of the clock. It is the relief from waking up and sleeping at designated times, the antidote to the mundane tasks that may otherwise lead to a feeling of being stuck. Freedom, in this context, becomes the key to unlocking a more meaningful and fulfilling life.

The Melody of Individuality :-

In the grand symphony of life, freedom takes the center stage as a harmonious melody. It is the music that plays when individuals break free from the ticking clock, allowing their spirits to dance in the realm of boundless possibilities. It is the sanctuary that breathes life into seemingly non-existing routines, infusing each moment with purpose and meaning.

Freedom lets individuals move to their unique rhythm. Freedom allows the expression of individuality, celebrates diverse perspectives, and acknowledges the beauty in each person's uniqueness. It is the melody that echoes with the authenticity of self-expression, creating an environment where individuals can truly be themselves.

Embracing the Beauty of Unique Existence :-

Freedom embodies the journey of self-discovery and genuine happiness, much like creating a beautiful canvas where personal choices paint a vibrant portrait of individuality. When individuals understand freedom not just as a concept but as a deeply felt experience, they can embrace the beauty of their own unique existence.

In conclusion, freedom goes beyond the borders of a free nation. It's a complete idea involving both outside freedoms and the freedom to make our own choices inside. It's like an adventure, a dance, and a beautiful song, telling us to enjoy the beauty of living freely.

Our duty is to encourage everyone in his struggle to live up to his own highest ideal and strive at the same time to make the ideal as near as possible to the truth. **– Swami Vivekananda**

A Poor Man and A Jinn

Meraj Hussain Ansari [Student, B.Ed. 1st Year]

Once upon a time, there was a man, his name was Ramesh. He lived in a small house with his wife. His wife's name was Kamala. Ramesh was very hardworking, but despite being hardworking, he was very poor. He used to cut wood from the forest and sell it. The condition of his house was very bad. They had to face a lot of problems when it rained. It was very difficult for Ramesh and his family to get even two meals a day. He was very troubled by his poverty and miserable life. But he did not lose courage and always prayed to God for his good life.

Like every day, one day Ramesh went to the forest to cut wood. He stood in front of a tree and as soon as he went to cut the tree, a voice came from that tree – Don't cut me, don't cut me. Ramesh got scared on hearing this voice and he wondered how this tree was speaking. He asked fearfully who are you ? Just then a huge Jinn comes out of that tree. Ramesh gets scared as soon as he sees that big Jinn. Then Jinn tells Ramesh that don't be afraid, I won't do anything to you. Jinn tells Ramesh that I have been living in this tree for many years, this tree is my home. You don't cut this tree, I will give you whatever you ask for in return. Ramesh thought what should I ask for ? Then Ramesh asked the Jinn, can you remove my poverty ? Jinn said yes. I can remove your poverty. The Jinn gave Ramesh a bag full of gold coins. Ramesh happily leaves for his home with the bag. After walking for some time it becomes night on the way. Ramesh takes shelter under a tree to spend the night. He was very tired so he fell asleep there. After he sleeps at night, an unknown man passes by. The man's eyes fall on Ramesh's bag. And the man steals Ramesh's bag. When Ramesh wakes up in the morning, he sees that his bag is not there. Ramesh starts searching for his hag here and there but he does not find it. He then goes to the same tree in which that Jinn lives. He asks the Jinn for help in finding his bag. The Jinn gives him three magical things, a Mirror, a Stick and a Rope. Jinn tells Ramesh that with the help of this Mirror you can see the face of the man who stole your bag and find out where that man lives. Explaining the special features of Rope and Stick, Jinn says that when you say Rope, this Rope will tie the man and when you say Stick, this Stick will start beating that man. With all these magical things, Ramesh set out to find the man who stole his bag. First of all Ramesh says to the Mirror that show me the face of that man and tell me the address of his house. The Mirror shows Ramesh the face of that man and tells the address of his house. Ramesh reaches the man's house with the help of the

Mirror. Ramesh asks the man for his bag, but the man refuses to give the bag. Ramesh says to the Rope that ties this man up. The Rope ties the man. Ramesh then asks the man, tell me where is my bag ? The man again refuses to tell. Now Ramesh says to Stick that hit this man. The Stick starts hitting the man. Then the man says to Ramesh that wait I will give you your bag. The man gives him the bag. Now Ramesh happily leaves for his home with his bag. He tells his wife kamala about all these incidents as soon as he reaches home. Hearing all this, Kamala is both happy and surprised. Ramesh gets his house repaired with that money and fulfills all his needs. After that, he helps the poor and the helpless people a lot with that money. He builds schools for children and free hospitals for the poor. And thus Ramesh and kamala spend all their life happily.

A Letter to Man

Aditya Panda **[Student, B.Ed. 1st Year]**

O Man, turn back to God !
And repent, with folded hands,
For the crimes that you committed
On these vast, holy lands.

Bereft of any pity or mercy
You ravaged the homes of others,
And cast away God's sacred word
To live in harmony, like brothers.

Drenched in the blood of innocent people
You remained shrouded in vanity,
Under your feet life an orphan lies
The lifeless corpse of humanity.

Put an end to this vicious cycle
For it will bring no good,
Welcome with open arms, the age of place
And proclaim Universal Brotherhood.

The Era of Revolutionised Artificial Intelligence

Souvik Dalui [Student, B.Ed. 1st Year]

Introduction :–

Few months ago, there was sudden enthusiasm about the innovation of "ChatGPT". Passionately I thought, let's see what does it actually contain. I asked a question, "Who was Banalata Sen ?" Banalata Sen is not a real person but a fictional character created by the renowned Bengali poet Jibanananda Das in his poem titled "Banalata Sen". This poem is one of Das's most famous works and is considered a classic in Bengali literature. Banalata Sen is depicted as a beautiful and enigmatic; woman, and her name has become emblematic in Bengali poetry, representing both beauty and the essence of the natural world. The poem is known for its vivid imagery and evocative descriptions of landscapes, time and the essence of beauty". This was the answer which may sound surprising but I could realize the capability, rules and regulations of this robot. Here, robot means not the human machine, its existence is limited only in computer screen. Therefore, it is actually a software. The term 'Chatbot' has been introduced to designate this machine software; 'Bot' comes from robot term and 'Chat' comes from the human like interactive nature of this software. ChatGPT is a timeless innovation of artificial intelligence.

The term artificial intelligence stirs emotions. For one thing there is our fascination with intelligence, which seemingly imparts to us humans a special place among life forms. Questions arise such as "What is intelligence ?", How can one measure intelligence ?" or "How does the brain work ?". However, the central question for the engineer, especially for the computer scientist, is the question of the intelligent machine that behaves like a person, showing intelligent behaviour. The goal of AI is to develop machines that behave as though they were intelligent. AI is concerned with building machines that can act and react appropriately, adapting their response to the demands of the situation. Such machines should display behaviour comparable with that considered to require intelligence in humans.

Artificial intelligence (AI) is an approach to understanding behaviour based on the assumption that intelligence can best be analyzed by trying to reproduce it. In practice, reproduction means simulation by computer. AI is, therefore, part of computer science. Its history is a relatively short one – as an independent field of study; it dates back to the mid-1950s. The AI approach contrasts with an older method of studying cognition, that of

experimental psychology. Psychology has long had intelligence among its central concerns, intelligence not just as measured in IQ tests, but in the broader sense in which it is required for thinking, reasoning and learning, and in their prerequisites – high-level perceptual skills, the mental representation of information and the ability to use language.

AI is defined as machine intelligence or intelligence demonstrated by machines, in contrast to the natural intelligence displayed by humans. The term AI is often used to describe machines that mimic human cognitive function such as learning, understanding, reasoning or problem-solving. Artificial intelligence (AI) systems are software (and possibly also hardware) systems designed by humans that, given a complex goal, act in the physical or digital dimension by perceiving their environment through data acquisition, interpreting the collected structured or unstructured data, reasoning on the knowledge, or processing the information, derived from this data and deciding the best action(s) to take to achieve the given goal. AI systems can either use symbolic rules or learn a numeric model, and they can also adapt their behaviour by analyzing how the environment is affected by their previous actions.

Types of AI :-

As a scientific discipline, AI includes several approaches and techniques, such as machine learning, machine reasoning and robotics. The technique of machine learning include deep learning and reinforcement learning. Machine reasoning include planning, scheduling, knowledge representation and reasoning, search and optimization. Robotics include control, perception, sensors, and actuators, as well as the integration of all other techniques into cyber-physical systems.

The majority of artificial intelligence (AI) in use today is known as artificial narrow intelligence (ANI), or "weak" AI. ANI systems are able to work in a predetermined context and carry out one or a few specialized tasks. Examples of these types of activities include language translation, picture recognition, face recognition, recommendation systems, and personal assistants like Siri and Alexa.

In numerous real-world applications, such as simultaneous translation between more than 100 languages, highly accurate face and object recognition in billions of photos, and expedited user assistance with numerous data-driven decisions, artificial neural networks (ANI) have the ability to process data at breakneck speeds and increase overall productivity and efficiency. ANI are capable of carrying out boring, repetitive, and routine jobs that people would rather not do.

Machines that demonstrate human intellect are referred to as "Strong" AI, or Artificial General intellect (AGI). Put differently, artificial general intelligence seeks to accomplish any cognitive function that a person can. Science fiction films frequently use scenarios

involving human interaction with sentient, conscious computers that are motivated by emotion and self-awareness to depict artificial intelligence (AGI). Nothing comparable to an AGI exists at the present.

"Any intellect that greatly exceeds the cognitive performance of humans in virtually all domains of interest" is the definition of artificial superintelligence, or ASI (Bostrom 2016). All areas of human intelligence, including creativity, general knowledge, and problem-solving, are expected to be surpassed by ASI. Even the sharpest minds among us have not demonstrated the kind of intelligence that ASI is expected to be able to display. ASI worries a lot of intellectuals. ASI now falls under the category of science fiction.

If we ever succeed in creating an AI that is capable of generalizing, understanding causality, making a model of the world, it is highly likely that it will be closer to ASI than AGI. AI excels in numerical calculations, and there is no logical explanation as to why AI would downgrade its abilities to simulate humans. AI's quest ultimately leads to ASI.

ML is an AI subfield. Machine learning (ML) is the scientific study of algorithms that computer systems that learn through experience. ML algorithms build a model based on sample data, known as "training data", in order to make predictions or decisions without being explicitly programmed to do so. ML can be divided into these categories :

* Supervised learning algorithms map input to output values based on labelled examples of input-output pairs. For example, we want to predict whether the image contains a cat, then the algorithm is shown a lot of labelled images with cats and without cats. Afterwards, the ML algorithm learns to recognize cats in unseen images. Supervised learning needs considerable amounts of labelled data, which is often done by humans.

* Unsupervised learning algorithms help finding previously unknown patterns in datasets without pre-existing labels. The objective is to discover the underlying data structure, for example, by grouping similar items to form "clusters". Unsupervised learning does not require labelled data, but instead tries to learn by itself.

* Semi-Supervised learning algorithms can be considered a category between supervised and unsupervised learning, where the data contains both labelled and unlabelled data.

* Reinforcement learning (RL) explores how agents take actions in an environment in order to maximize a reward. An example is when the RL agent plays Go against itself, learns the game, and acquires above human intelligence in Go.

Evolution of AI :–

AI Foundations (1950s - 1970s)

In his seminal work "Computing machinery and intelligence" (Turing 1950), Alan Turing addressed the central query, "Can machines think ?" In an imitation game that he proposed - later dubbed the Turing test - Turing asked whether it would be realistic to declare that a machine is intelligent if it could have a conversation that was indistinguishable from one with a human. The first experiment designed to gauge computer intelligence was the Turing test.

The Dartmouth conference in 1956 marked the start of the first "AI period" and gave AI its name and purpose. McCarthy first used the term "artificial intelligence", which later became the field's official moniker. "Every aspect of any other feature of learning or intelligence should be accurately described so that the machine can simulate it" was the main conference claim, according to Russell and Norvig (2016). Ray Solomonoff, Oliver Selfridge, Trenchard More, Arthur Samuel, Herbert A. Simon, and Allen Newell were among the conference attendees who went on to become influential people in the field of artificial intelligence.

Symbolic AI (1970s - 1990s)

The paradigm for AI changed in the 1980s to include symbolic AI and what are today referred to as "expert systems" or 'knowledge-based systems". The fundamental concept was to transfer expert human knowledge into a computer format and distribute it across numerous Personal Computers (PCs) as a programme. The two parts of an expert system were the inference engine, which provided instructions on how to manipulate and combine these symbols, and the knowledge base, which was a collection of relationships, facts, and rules on a certain topic. Both the facts and the rules were represented clearly and could be changed. The two-primary language for symbolic programming were Lisp and Prologue. Companies started producing expert systems in the 1990s. These companies offered software packages called "inference engines" and related knowledge services to customers.

Machine learning and deep learning (1990s - 2020s)

Between the 1990s and the 2010s, artificial intelligence (AI) tackled difficult issues and produced solutions that were deemed to be helpful in a variety of application areas, such as data mining, banking software, industrial robotics, logistics, business intelligence, recommendation systems, and search engines. Researchers in AI started creating and utilizing increasingly complex mathematical instruments. The fact that a large number of AI issues had previously been studied by academics in disciplines like operations research. economics, and mathematics became well known. Because of the common mathematical

language, AI has become a more rigorous scientific discipline and has enabled increasing levels of collaboration with established sciences.

Throughout the 1990s, a large number of AI researchers purposefully used different terms for their work, such as informatics, knowledge-based systems, cognitive systems, optimization algorithms, or computational intelligence. The new titles aided in securing financing. The unfulfilled expectations of the AI Winter persisted in influencing AI research across the business sector.

A paradigm shift was facilitated in 2006 by Stanford University computer science professor Fei-Fei Li. The researcher's conventional view at the time was, "Why try with thousands or tens of thousands of images if you can't even do one image well ?" According to her theory, the amount of data needed to represent real-world events is AI's primary barrier, and more data would result in stronger models. When ImageNet was released in 2009, it contained 3.2 million tagged photos that were divided into 5,247 categories and organized into 12 subtrees, such as "furniture," "vehicle," and "mammal".

Over the past ten years, there has been a notable advancement in the annual ImageNet large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC). In 2011, the ILSVRC classification error rate was approximately 25% on average. A deep convolutional neural net known as AlexNet achieved a 16% classification error rate in 2012, and mistake rates dropped to a few percent during the following few years. Deep learning (DL) became the new paradigm in AI as a result of these breakthroughs.

DL is a branch of ML and AI. According to LeCun et al. (2025), DL developed a multi-layer neural network architecture that can learn data representations at different levels of abstraction. Convolutional neural networks (CNN), recurrent neural networks, deep neural networks, and deep belief networks are examples of DL neural network architectures. DL is frequently replaced by AI or ML, particularly in the news and media.

Issues :–

A number of problems with deep learning need to be resolved, such as adversarial assaults, the production of deep fake material, accountability, transparency, fairness, and other ethical difficulties. Here, we'll merely touch on a few concerns, their effects, and potential fixes.

Adversarial attacks

The goal of adversarial machine learning is to trick models by providing false information. This is most likely the most frequent reason why an ML model breaks. The majority of machine learning approaches were created to operate on particular problem sets where the training and test data come from the same statistical distribution. Adversaries

may provide data that defies that statistical assumption in the real world. Attackers can set up the data to take advantage of particular flaws and cause the ML model to collapse severely.

Adversarial instances, or hostile inputs altered to produce false machine model outputs, might weaken DL. In a well-known adversarial scenario, an image recognition system fails when a minor perturbation is added to a panda image (see Figure 8). Adversarial attacks pose a serious risk. For instance, they can use paint or stickers to turn autonomous vehicles into adversarial stop signs.

Deepfake

AI is reducing the cost of generating fake content and waging disinformation campaigns. The public will need to become more skeptical about online content, including text, speech, images, and videos. AI can :

- ✤ Impersonate others online,
- ✤ Generate fake images and news,
- ✤ Automate production of fake content often posted on social media,
- ✤ Automate creation of spam/phishing content.

Deepfake videos and images can depict a person saying things or performing actions that never occurred. Malicious actors with fake accounts have already begun to target the online community. For instance, it is reported that Mona Lisa can speak with only one image, or that criminals have impersonated CEOs' voice and stole millions.

AI ethics

Over the last years, researchers and practitioners have expressed their concerns on the ethical implications of AI systems in real-world scenarios. The European Commission appointed the High-Level Expert Group (GLEG) on AI in 2018 and one of their tasks has been to define ethical guidelines for trustworthy AI. This section is taken from the "Ethics Guidelines for Trustworthy AI". For an AI system to be trustworthy, it should ensure the following three components through the system's entire life cycle:

1. Lawful, complying with all applicable laws and regulations,
2. Ethical, ensuring adherence to ethical principles and values,
3. Robust, both from a technical and social perspective, since even with good intentions, an AI system can cause unintentional harm.

The four ethical principles which are rooted in fundamental rights that must be respected to ensure that AI systems are developed, deployed, and used in a trustworthy manner are :

- ✤ Respect for human autonomy,
- ✤ Prevention of harm,
- ✤ Fairness,
- ✤ Explain ability.

Many of them already have legal criteria in place that necessitate mandatory compliance; as such, they fall under the category of lawful AI, which is the first element of trustworthy AI. As previously mentioned, although a lot of legal requirements are based on ethical concepts, upholding ethical values involves more than just following the letter of the law. These are outlined as moral requirements that Ai professionals should constantly try to follow.

Conclusions :–

Our analysis considers the parallels and discrepancies throughout AI eras. A similar pattern can be seen in the first two AI periods, which begin with a scientific breakthrough and paradigm change in research, and are followed by audacious predictions, extensive media coverage, substantial investments, setbacks, unmet expectations, and the beginning of an AI winter.

The first two periods saw a preponderance of government funding, while today's sector is heavily investing in AI advancements. In the first two periods, academia led basic research in AI; in the present, certain technical corporations lead basic research as well. because these businesses offer state-of-the-art computing capabilities, extensive datasets, and favorable working conditions that are frequently unavailable in academic settings, they have been drawing top AI experts. Governments who see the potential are allocating large sums of money to artificial intelligence.

Computers are capable of trillions of computations per second and AI tasks that are beyond the capabilities of human beings. AI outperforms humans in a number of activities, such as playing chess, instantly translating more than 100 languages, identifying spam from billions of emails, and quickly identifying objects in billions of photos. Even the most sophisticated AI, in spite of these astounding feats, is unable to move and speak, comprehend the environment, understand causality, or engage in conversation about abstract ideas like a four-year-old child. Even with decades of progress in AI, a billion years of evolution cannot be replaced.

Undoubtedly, AI has drawbacks as well, and using it can lead to unanticipated hazards. A number of AI flaws, such as representativeness and data quality, can result in low-performing, biased AI. AI can be used by bad actors to create deepfakes, fabricate news, launch highly automated cyberattacks, and other things. Concerns about AI must be addressed. Government regulation is being prepared by the several AI ethics committees that are addressing fairness, accountability, transparency, explainability, and other related issues.

It's unclear if artificial intelligence will experience another AI winter or an even bigger AI summer in the future. In light of this uncertainty, it will be especially crucial to establish an objective project like AI Watch to track developments and evaluate their effects in the upcoming years, which will undoubtedly bring about major changes to our digitally revolutionized society.

Reference :–

Rupainwar, A. (n.d). Educational

Ertel, W. (2018). Introduction to artificial intelligence. Springer.

Finlay, J. (2020). An introduction to artificial intelligence. Crc Press.

Garnham, A. (2017). Artificial intelligence; An introduction, Routledge.

Bertram R. (1972), Robot Research at Stanford Research Institute. STANFORD RESEARCH INST CA.

Bostrom, N. (2016). Superintelligence : Paths, Dangers, Strategies, Reprint ed.

Brown, N., & Sandholm, T. (2018). Superhuman AI for heads-up no-limit poker : Libratus beats top professionals. Science, 359(6374), 418-424.

Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. Machine learning, 20(3), 273-297.

Craglia M., (Ed.), Annoni A., Benczur P., Bertoldi P., Delipetrev B., De Prato G., Feijoo C., Fernandez Macias E., Gomez E., Gomez E., Iglesias M., Junklewitz H., Lopez Cobo M., Martens B., Nascimento S., Nativi S., Polvora A., Sanche. I., Tolan S., Tuomi I., Vesnic Alujevic L., Artificial Intelligence - A European Perspective., EUR 29425 EN, Publications Office, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-97218-5, dos : 10.2760/936974, JRC1 13826.

Dean, J., Patterson, D., & Young, C. (2018). A new golden age in computer architecture : Empowering the machine-learning revolution. IEEE Micro, 38(2), 21-29.

Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L. J., LI, K., & Fei-Fei, L. (2009). ImageNet : A large-scale hierarchical image database. In 2009 IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 248-255). IEEE.

EC. (2018). "Coordinated Plan on Artificial intelligence." Text. Digital Single Market - European Commission. December 7, 2018. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coordinated-plan-artificial- intelligence. (COM(2018) 795final).

EC. (2020). COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS : A European strategy for data". European Commission, Brussels, 19.2.2020 COM(2020) 66 final.

HLEG, A. I. (2019). Ethics guidelines for trustworthy AI. B-1049 Brussels. Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. Neural computation, 9(8), 1735-1780.

Hopfield, J. J. (1982). Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. Proceedings of the national academy of sciences, 79(8), 2554-2558.

Delipetrev, B., Tsinaraki, C., & Kostic, U. (2020). Historical evolution of artificial intelligence.

Echoes of Enlightenment : Exploring the Nexus of World Literature and Philosophical Wisdom

Soubhik Kundu [Student, B.Ed. 1st Year]

Philosophy tells us what we can know about the world; literature tells us what we feel about it.

– Robertson Davies

Robertson Davies encapsulates the distinct yet complementary roles of philosophy and literature in understanding the world, saying that philosophy, through reasoned inquiry and analysis, provides us with knowledge and insights about the nature of reality, truth, and the world around us. Philosophy aims to uncover objective truths, explore fundamental principles, and decipher the workings of the universe through logic and rationality. On the other hand, literature engages with subjective experiences, emotions, and the human condition. It doesn't seek to present objective truths; rather communicates feelings, perspectives, and the depth of human experiences through narrative, characters, and artistic expression. Literature allows us to empathise, feel, and emotionally connect with the world and the experiences of others. In essence, while philosophy seeks to uncover what can be objectively known about the world, literature delves into the emotional and subjective responses, reflecting the diverse and nuanced ways individuals perceive and feel about the world around them. Together, they offer a comprehensive understanding of both the objective and subjective aspects of human existence.

The term "philosophy" originates from two Greek words: philo, meaning "love," and sophia, meaning "wisdom" or "knowledge." Thus, the compound word "philosophy" translates to "love of wisdom" or "the pursuit of knowledge." "Literature" finds its origins in the Latin term litteratura, which initially referred to writing formed with letters or alphabets. Over time, its meaning expanded to encompass a broader sense of written or printed works of art, knowledge, or culture. Thus the inner meaning of the two words suggest the relationship between "philosophy" and "literature", as one is love for knowledge and the other one is the way of expressing knowledge.

Philosophical influence on literature varies across different regions and perspectives. In Europe, some critics argue that heavy philosophical themes in literature might overshadow

the artistic and aesthetic aspects of the work. They suggest that an excessive focus on conveying philosophical ideas could compromise the beauty of language, storytelling, or character development. Conversely, proponents of philosophical influence on literature argue that it enriches the depth and meaning of literary works. They believe that philosophical themes enhance the intellectual and emotional resonance of literature, offering readers deeper insights into the human condition and societal issues. In Asia, especially in countries like India, Japan, or China, philosophical influence on literature is often seen as an inherent aspect, deeply embedded in the cultural and historical context. Critics might contend that an overemphasis on Western philosophical concepts could overshadow or dilute the indigenous philosophical traditions present in Asian literature. However, many see infusion of philosophical ideas into literature as a means of enriching storytelling, providing a deeper understanding of cultural values, and fostering dialogue between different philosophical traditions. Criticism varies widely based on individual perspectives, with some valuing the fusion of philosophy and literature while others caution against the potential overshadowing of literary elements by philosophical themes.

Greek philosophers have had a profound influence on European literature, often serving as sources of inspiration or philosophical themes for various authors. In English literature, the works of Greek philosophers like Plato and Aristotle have left a lasting impact. Plato's philosophical ideas about ideal forms, the nature of reality, and the allegory of the cave, for instance, have been referenced in numerous literary works. Writers like William Blake, who incorporated Platonic concepts into his poetry, and Aldous Huxley, who drew on philosophical ideas in his novel "Brave New World," exemplify this influence. Aristotle's teachings on tragedy, ethics, and politics have also influenced English literature. His principles of dramatic structure and tragic flaw, outlined in "Poetics," have shaped the development of tragedy in English drama, notably seen in the works of Shakespeare, Marlowe, and other playwrights. In German literature, the influence of Greek philosophy, particularly that of Plato and Aristotle, is notable as well. German writers and thinkers like Johann Wolfgang von Goethe were deeply influenced by ancient Greek philosophy. Goethe's philosophical novel "Wilhelm Meister's Apprenticeship" reflects his engagement with Aristotelian ideas about education, personal development, and the pursuit of self-realisation. Additionally, Friedrich Nietzsche, though critical of traditional philosophy, engaged extensively with Greek philosophy in his works. His reinterpretation of Greek tragedy and his ideas on the Dionysian and Apollonian principles drew heavily from the works of Greek philosophers. Both English and German literature showcase a rich tapestry of engagement with Greek philosophical ideas, demonstrating how these ancient philosophies continue to inspire and influence literary creativity across different cultures and time periods.

Philosophy, although, has several divisions and countless views, literary works of many scholars have emphasised more on pragmatic and naturalistic philosophy.

Pragmatism as a formal philosophy emerged in Milton's writings, especially concerning his views on free will, individual agency, and the pursuit of truth. Milton's emphasis on the individual's capacity for choice and action reflects a pragmatic stance. His portrayal of characters like Satan, who exercises free will despite consequences, showcases the significance of personal agency and the repercussions of one's decisions. This resonates with pragmatic thought, which emphasises practical consequences and the importance of individual choices. Moreover, Milton's exploration of the nature of truth and knowledge in "Paradise Lost" aligns with pragmatic philosophy's focus on truth as a practical tool. He presents different perspectives on truth and knowledge, inviting readers to critically engage with conflicting ideas, which is reminiscent of the pragmatic approach to truth as something that evolves through experience and inquiry.While Milton's works predate the formal development of pragmatism, his emphasis on individual choice, the practical consequences of actions, and the exploration of truth through diverse perspectives echo some foundational principles of pragmatist thought.

Naturalist philosophy, emphasising scientific observation, determinism, and the influence of the environment on human behaviour, has left its mark on both English and Spanish literature.

In English literature, authors like Thomas Hardy and Emile Zola incorporated naturalist elements into their works. Hardy's novels, such as "Tess of the d'Urbervilles" and "Jude the Obscure," exhibit deterministic forces shaping characters' lives, highlighting how environmental factors can influence and limit individual agency. Similarly, Emile Zola's works, such as "Germinal" and "Nana," exemplify naturalist themes by portraying characters trapped in social circumstances beyond their control, often succumbing to the forces of heredity, environment, and economic pressures. In Spanish literature, naturalist elements can be seen in the works of authors like Benito Pérez Galdós. His novels, including the "Episodios Nacionales" series and "Fortunata and Jacinta," delve into the social and moral issues of 19th-century Spain. Galdós explores the impact of environment, social conditions, and heredity on characters' lives, reflecting naturalist themes prevalent in his storytelling.

The relationship between comparative literature and philosophy offers a multifaceted exploration of human thought, cultural expressions, and existential questions. While each field brings its unique methodologies and perspectives, their intersection enriches the understanding of both literary and philosophical texts.

Comparative literature often intersects with philosophy due to its interdisciplinary nature. It examines literary texts across cultures, languages, and historical periods, which can include philosophical texts. This interdisciplinary approach allows for a deeper exploration of philosophical themes, ideas, and perspectives within various literary works. Comparative Literature and philosophy, both fields explore similar themes, their methodologies differ. Philosophy often approaches ideas systematically, through logical reasoning and argumentation. Comparative literature, on the other hand, employs a broader range of methodologies, including literary analysis, historical context, linguistic studies, and cultural studies.

Philosophical views and its movements through literary works have boundaries as they are time and area centric.

Epic literature, in the early or ancient age, often intertwines with philosophical themes, providing a platform for exploring profound questions about human existence, morality, ethics, and the nature of reality. "The Iliad" and "The Odyssey" by Homer, delve into the human condition, exploring themes of heroism, mortality, fate, and the complexities of human emotions. Philosophical inquiries about the nature of life, the inevitability of death, and the struggles of mortal beings are interwoven into the narratives of these epic poems. Indian epics like "The Mahabharata" and "The Ramayana" grapple with ethical dilemmas, moral choices, and the concepts of duty and righteousness. These epics present philosophical questions about the nature of dharma (duty) and karma (action), raising discussions on ethical conduct and societal responsibilities. "Gilgamesh", in Mesopotamian literature explores the quest for knowledge, immortality, and the meaning of life. Philosophical themes such as the pursuit of wisdom, the inevitability of mortality, and the human desire for transcendence are central to this ancient epic.

European mediaeval philosophy, heavily influenced by Christian theology, focused on reconciling faith with reason. Works by philosophers like St. Augustine and St. Thomas Aquinas emphasised the harmony between faith and philosophy. This period often saw literature intertwined with religious themes, such as Dante's "Divine Comedy." On the contrary, American literature was influenced by Puritanism, reflected religious themes, moral dilemmas, and the quest for spiritual fulfilment. Asian mediaeval philosophy, including Buddhist, Confucian, and Taoist thought, greatly influenced Asian literature. Concepts of karma, societal harmony, and the nature of existence permeated literary works, often blending philosophical teachings with storytelling traditions.

The emergence of modern philosophy in Europe, marked by thinkers like Descartes, focused on rationalism, scepticism, and the scientific revolution. This period saw a shift towards secularism and empirical inquiry, reflected in literature. Authors like Voltaire and Rousseau questioned traditional authority and religious dogma, impacting literary works

for instance Voltaire's "Candide." American literature, with the Enlightenment and the subsequent Transcendentalist movement, increasingly explored themes of individualism, nature, and human potential. Philosophical ideas from thinkers like Emerson and Thoreau shaped American literary works, emphasising self-reliance and the connection between humans and nature. In Asia, modern philosophical movements were shaped by encounters with Western ideas during colonisation. This period saw a fusion of traditional Asian philosophies with Western concepts in literature, addressing issues of cultural identity, modernisation, and societal change.

Several theorists have introduced different theories regarding the relationship between comparative literature in the world based on their philosophical approach.

1. Mimesis and Poetics by Aristotle :

Aristotle's "Poetics" delves into the concept of mimesis, or imitation, in literature. He explores how literature imitates life and the role of art in portraying reality. Aristotle's work emphasises the ways in which literature reflects philosophical truths about human nature and societal structures through imitation.

2. Existentialism in Literature :

Existentialist philosophers like Jean-Paul Sartre and Albert Camus explored existential themes in literature. They believed that literature, especially novels and plays, offered a space to depict the complexities of human existence, freedom, responsibility, and the absurdity of life. Existentialist literature often serves as a means to convey philosophical ideas about the human condition.

3. Hermeneutics and Interpretation :

Philosophers like Hans-Georg Gadamer proposed hermeneutics as a theory of interpretation. This theory examines how understanding and interpretation shape our engagement with literary texts. Hermeneutics suggests that literature acts as a vehicle for conveying deeper truths, and our interpretation of these texts is intertwined with our philosophical frameworks and historical contexts.

4. Deconstruction in Literary Theory :

Jacques Derrida's deconstruction theory challenged traditional notions of language, meaning, and truth. Deconstructionism in literature examines how language constructs meaning and how texts contain inherent contradictions. This theory suggests that literature reveals philosophical complexities and inherent tensions within language and communication.

5. Aesthetic Theory of Art in Literature :

Philosophers like Immanuel Kant and Theodor Adorno developed aesthetic theories

about art, including literature. Kant's aesthetic theory emphasises the role of aesthetic experience in literature, suggesting that literary works evoke a disinterested pleasure and offer a unique mode of knowledge. Adorno's critical theory examines how literature engages with societal issues and offers critical insights into culture and politics.

6. Reader Response Theory :

This theory, proposed by theorists like Wolfgang Iser and Stanley Fish, focuses on the role of the reader in interpreting texts. Reader Response Theory suggests that meaning in literature is not solely derived from the author's intent but is constructed through the interaction between the text and the reader's experiences, beliefs, and cultural context.

These theories offer diverse perspectives on how literature and philosophy intersect, illustrating how literary works convey philosophical ideas, challenge established norms, and engage readers in contemplating existential, ethical, and societal issues.

Metaphysics, the branch of philosophy concerned with the nature of existence, reality, and the fundamental principles underlying existence, often intertwines with literature to add depth, complexity, and philosophical value to literary works. In Haruki Murakami's "Kafka on the Shore," metaphysical elements intertwine with the narrative, blurring the boundaries between reality and dreams. The novel explores themes of existence, identity, and the nature of reality through surreal and enigmatic occurrences, prompting readers to question conventional perceptions of existence. Jorge Luis Borges' short story "The Garden of Forking Paths" delves into metaphysical concepts of time and infinity. The narrative explores the intricacies of time and alternate realities, challenging conventional notions of temporal existence and the interconnectedness of events. Philip K. Dick's "Do Androids Dream of Electric Sheep?" delves into metaphysical themes by questioning the nature of consciousness and the essence of humanity. It probes the boundaries of identity, ethics, and empathy, raising philosophical inquiries into the nature of being. Franz Kafka's "The Metamorphosis" employs metaphysical allegory, using the protagonist's transformation into an insect as a symbol of existential alienation and the human condition. Metaphysical themes add depth to literary works, stimulating philosophical inquiry and inviting readers to contemplate fundamental questions about existence, consciousness, and reality. By engaging with metaphysical elements, literature encourages readers to ponder the mysteries of existence and the nature of truth. It often manifests through evocative imagery and symbolism in literature, offering authors rich symbolic tools to convey complex philosophical ideas. Symbolism adds layers of meaning, inviting readers to interpret deeper allegorical messages embedded within narratives. Literature incorporating metaphysical themes prompts readers to reflect on their own perceptions, beliefs, and existential queries. By engaging with metaphysical concepts in literary works, readers are invited to explore personal interpretations and contemplate the complexities of the human condition.

Various philosophical movements throughout history influence Literature in a specific area.

British literature as well as German, French and other European literary works get influenced by renaissance, enlightenment, Victorian morality and so forth.

During the Renaissance, the revival of classical learning and humanist ideas profoundly influenced British literature. Humanist philosophers like Erasmus emphasised the dignity of human beings and the pursuit of knowledge. It influenced writers like Shakespeare, whose works explored human nature, morality, and the complexities of the human condition. Humanism in the Renaissance period is followed by Rationalism which comes through enlightenment. Enlightenment philosophers like John Locke and Voltaire advocated reason, scientific inquiry, and individualism. Their ideas on liberty, progress, and the social contract influenced British literature. Writers like Alexander Pope and Jonathan Swift used satire and reason to critique society and politics in their works. William Blake, later, conjugates individualism with romanticism. The Romantic movement, with its emphasis on nature, emotion, and individualism, deeply impacted British literature. Philosophers like Rousseau and Kant influenced Romantic poets like William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. Their poetry celebrated nature, the imagination, and the individual's emotional experience. The Victorian era, in the next, was marked by a moral and social consciousness influenced by philosophical thinkers like John Stuart Mill. Authors such as Charles Dickens and George Eliot addressed social issues and moral dilemmas in their realistic novels, reflecting the moral concerns of the time.

Existentialist and modernist philosophies, emerging in the twentieth century, influenced British literature. Existentialist ideas about the absurdity of existence and individual freedom influenced writers like Samuel Beckett and Jean-Paul Sartre. Modernist writers like T.S. Eliot and Virginia Woolf experimented with narrative forms, reflecting the fragmented nature of reality. Postmodernist and deconstructionist philosophers, in the nineteenth century, challenged traditional norms and questioned the stability of truth and language. This influenced British literature in the latter half of the 20th century. Authors like Salman Rushdie and Jeanette Winterson experimented with narrative structures and cultural identities, reflecting postmodern concerns.

Works of Immanuel Kant and G.W.F. Hegel emphasised ideas about consciousness, freedom, and the nature of reality. German Idealism influenced literary works such as Goethe's "Faust" which delves into existential questions, moral dilemmas, and the pursuit of knowledge, reflecting elements of Kantian and Hegelian thought. The Romantic movement in Germany explored emotions, nature, and the individual's relationship with the divine. Literary works by Friedrich Schiller's "The Robbers" and Novalis' "Hymns to the Night" reflected Romantic ideals, exploring themes of passion, freedom, and the sublime in nature.

Friedrich Nietzsche's existential and nihilistic ideas in the nineteenth century had a profound impact on German literature. His philosophical concepts, found in works like "Thus Spoke Zarathustra," influenced writers such as Thomas Mann and Hermann Hesse , who explored existential themes, the search for meaning, and the human condition in "The Magic Mountain" and "Steppenwolf" respectively. French Enlightenment thinkers like René Descartes and Voltaire championed reason, tolerance, and social progress. Voltaire's philosophical ideas influenced his literary works, including "Candide," which satirically critiques societal norms, religious dogma, and the human condition. Moreover, Existentialism, epitomised by Jean-Paul Sartre and Albert Camus, explored themes of existence, freedom, and the absurdity of life. Sartre's plays like "No Exit" and Camus's novel "The Stranger" reflect existential dilemmas, moral responsibility, and the search for authenticity. French thinkers like Michel Foucault and Jacques Derrida in the twentieth century contributed to structuralism and post-structuralism, which challenged fixed meanings and explored language and power. Their philosophical ideas influenced literary theory, impacting how literature is interpreted and understood.

Literary works in Germany and France have been deeply influenced by the philosophical underpinnings of their respective eras, from the rationalism of the Enlightenment to the existential inquiries of the 20th century. These philosophical movements have left indelible imprints on literature, shaping its themes, narrative styles, and intellectual inquiries.

American literature, in comparison with European literature, has been greatly influenced by various philosophical, industrial and freedom movements that have shaped its themes, styles, and cultural significance.

Transcendentalism, spearheaded by thinkers like Ralph Waldo Emerson and Henry David Thoreau, emphasised the individual's intuition, spirituality, and connection with nature. This movement influenced American literature, with works like Emerson's essays and Thoreau's "Walden" exploring self-reliance, nature, and the search for truth. Writers like Edgar Allan Poe and Nathaniel Hawthorne explored dark themes and psychological complexities, while poets like Walt Whitman celebrated the democratic spirit and individualism in their works.

Philosophers like William James and John Dewey developed Pragmatism which emphasis on practicality, experience, and interrogation of truth through action. Authors like Mark Twain and William Faulkner reflected pragmatic perspectives in their works, critiquing society and exploring human nature. Naturalism and Realism, influenced by philosophical ideas about determinism and the impact of the environment on human behaviour, shaped American literature in the late nineteenth and early twentieth centuries. Writers like Stephen Crane and Theodore Dreiser depicted gritty, realistic portrayals of life

and society. Existentialist themes of individual freedom, authenticity, and the search for meaning influenced American literature in the mid-twentieth century. Authors like Jack Kerouac and J.D. Salinger explored existential ideas in their works, reflecting the angst and alienation of the post-war era. Postmodernist and deconstructionist philosophers challenged traditional norms in American literature. Authors like Thomas Pynchon and Toni Morrison experimented with narrative structures, cultural identities, and metafictional elements.

Following the immense cultural and philosophical enhancement in the Northern part of America, a typical and rich tapestry of cultural, historical and philosophical view influences Caribbean literature which deals with its history of colonisation, slavery, migration, and cultural diversity. The philosophical underpinnings within Caribbean literature are diverse and multifaceted, drawing from various ideological and philosophical perspectives.

Caribbean literature, on the contrary, often reflects the postcolonial condition, exploring themes of identity, cultural hybridity, and the impact of colonialism on society. Writers like Derek Walcott and Aimé Césaire incorporate postcolonial theories and resistance against cultural hegemony in their works, emphasising cultural pride and decolonization. Moreover, it celebrates creolization, blending African, European, and Indigenous cultures. Writers like Jean Rhys and Jamaica Kincaid explore themes of identity, displacement, and cultural fragmentation resulting from the blending of diverse cultures in the Caribbean. Caribbean literature often draws from the rich oral tradition and storytelling practices rooted in African and Indigenous cultures. This emphasis on orality and communal storytelling reflects philosophical notions of collective memory, communal identity, and the power of narratives grappling with issues of diaspora, migration, and exile, exploring the complexities of identity in a transnational context. Writers like V.S. Naipaul and Edwidge Danticat examine the psychological impact of displacement, reflecting philosophical ideas about belonging, rootlessness, and cultural dislocation.

This particular literature engages with liberation movements and social justice. Frantz Fanon and C.L.R. James articulates philosophical perspectives on colonialism, race, and oppression, advocating for social change and decolonization. Existential themes of alienation, freedom, and the search for meaning are prevalent in Caribbean literature. Authors like Wilson Harris and Kamau Brathwaite explore existential questions, connecting personal experiences to larger historical and cultural contexts, emphasising the importance of cultural memory and history.

Western philosophy, while concerned more with pragmatism and reality, Eastern hemisphere mainly deals with the history, nature and culture backdropping the rich and older philosophical view.

Vedanta philosophy, emphasising the concepts of Atman (self) and Brahmana (universal soul), has had a significant impact on Indian literature. Works such as the *Upanishads, Bhagavad Gita, the Mahabharata and the Ramayana* reflect Vedantic ideas about the nature of reality, the self, and spiritual liberation. Writers like Rabindranath Tagore and Swami Vivekananda incorporated Vedantic themes in their literary and philosophical works.

Philosophy of Buddhism and Jainism emphasis on impermanence, suffering, and the pursuit of enlightenment influenced literature. Buddhist Jataka tales, as well as works like Asvaghosha's Buddhacarita, highlight moral teachings and the path to enlightenment. These philosophical concepts influenced the writings of Indian poets like Ashvaghosha and Kalidasa. Moreover, the mystical approach and themes of divine love and spiritual unity in Sufism influenced Indian literature, especially in poetry. Sufi poets like Rumi, Hafiz, and Amir Khusrow expressed Sufi ideals through ghazals and mystical poetry, which had a significant impact on Indian poets like Kabir, Bulleh Shah, and Amir Khusro.

Advaita Vedanta, propagated by Adi Shankaracharya, emphasises the non-dual nature of reality. This philosophy influenced literary works like Shankaracharya's own compositions and the poetry of saints like Sant Tukaram and Sant Dnyaneshwar, who conveyed Advaita principles in their devotional writings. The Bhakti movement, emphasising devotion and love towards a personal god, influenced a vast body of devotional literature. Saints like Mirabai, Surdas, Tulsidas, and Kabir expressed their devotion through poems and songs, contributing to a rich tradition of Bhakti poetry that blends philosophical ideals with emotional fervour.

Modern Indian literature continues to engage with philosophical movements. Neo-Vedanta, as propagated by Ramakrishna Paramahamsa Dev and Swami Vivekananda, addresses contemporary issues and has inspired writers like Rabindranath Tagore, whose works often reflect modern philosophical and spiritual inquiries.

These philosophical movements, with their varied ideologies and spiritual teachings, have deeply influenced the themes, expressions, and moral underpinnings of Indian literature, shaping its richness and diversity across different languages and regions in India.

Another rich Asian or Eastern literature is Chinese literature that is deeply intertwined with philosophical traditions that have shaped its themes, styles, and cultural significance over centuries. Confucianism in Chinese literature emphasis on ethics, social order, and moral values profoundly influenced Chinese literature. Works like "The Analects of Confucius" and "Dream of the Red Chamber" by Cao Xueqin reflect Confucian values of filial piety, social hierarchy, and the importance of moral conduct.

Taoist philosophy, centred on harmony, naturalness, and the Tao, influenced Chinese poetry and prose. The works of Taoist philosophers like Laozi and Zhuangzi, and poets like Li Bai and Du Fu, reflect themes of spontaneity, nature, and the ineffable beauty of existence. Like Indian literature, Buddhism's emphasis on enlightenment, compassion, and the transient nature of life influenced Chinese literature. Buddhist sutras and philosophical texts, along with literary works like "Journey to the West" by Wu Cheng'en, explore themes of spiritual enlightenment, karma, and the human condition. Chinese literature often reflects the concept of filial piety and moral ethics prevalent in Confucian thought. Stories like "The Twenty-Four Filial Exemplars" highlight moral virtues and the importance of family relationships and moral obligations.

The philosophical concept of Yin-Yang, representing dualistic forces in harmony, influences Chinese literature. It manifests in poetry and prose, exploring the balance between opposites, such as light and darkness, chaos and order, in works like "The Book of Songs" and "The Art of War" by Sun Tzu. This literature often critiques societal norms and advocates for change. Modern works by authors like Lu Xun and Lao She reflect philosophical concerns about societal reform, individualism, and the impact of modernization on traditional values. Chinese literature's philosophical depth lies in its integration of Confucian, Taoist, and Buddhist principles, offering nuanced reflections on ethics, spirituality, human nature, and societal values.

Islamic philosophy influenced by thinkers like Avicenna (Ibn Sina) and Averroes (Ibn Rushd), permeates Middle Eastern literature. Works such as Rumi's "Masnavi" and Attar's "The Conference of the Birds" reflect Sufi mysticism, exploring themes of divine love, spiritual transformation, and the quest for unity with the divine. Arabic poetry integrates philosophical themes, drawing from classical Arabic philosophers like Al-Farabi and Al-Ghazali. Poetry by figures such as Al-Mutanabbi and Abu Nuwas embodies philosophical reflections on beauty, love, mortality, and the human condition. Middle Eastern literature often grapples with questions of cultural identity, tradition, and modernity. Works by authors like Naguib Mahfouz in "The Cairo Trilogy" and Khalil Gibran in "The Prophet" explore philosophical themes of cultural heritage, societal change, and the clash between tradition and modern values.

Middle Eastern literature serves as a platform for political and social commentary. Authors like Ghassan Kanafani and Nawal El Saadawi use literature to critique political systems, social injustices, and the complexities of power dynamics in the region delving into existential themes, questioning the nature of existence, freedom, and morality. For example, the works of Mahmoud Darwish, a Palestinian poet, reflect existential concerns about identity, exile, and the struggle for self-determination. It often engages in dialogues between different religious and philosophical traditions. "The Conference of the Birds" by

Attar exemplifies this, presenting allegorical discussions among birds representing various spiritual paths, emphasising unity and transcending religious differences.

Although comparative world literature is mainly based in Europe, America and Asia, the alienated, small yet significant portion of the world, Australia and its surrounding islands have grown their own philosophical aspect reflecting through their literary works. Patrick White's novel "Voss" explores the Australian landscape and its impact on human existence. The novel delves into the character Voss's obsession with exploring the outback, reflecting existential themes of isolation, the human-nature relationship, and the quest for meaning in a vast and unforgiving landscape. Whereas, Peter Carey's "Oscar and Lucinda" grapples with questions of identity, cultural clash, and the complexities of colonial Australia. This novel navigates the lives of two characters from different cultural backgrounds, exploring their struggles to find a sense of belonging in a multicultural society.

Postcolonialism and Indigenous Perspectives is a significant factor in the Australian literary movement. Alexis Wright's "Carpentaria" reflects Indigenous perspectives and challenges postcolonial notions depicting local mythology, Indigenous spirituality, and the struggle against colonialism, offering a philosophical exploration of the Indigenous relationship with land, spirituality, and resistance. David Malouf's "Remembering Babylon" addresses existential themes of belonging and identity. The story revolves around a white man who grows up with an Indigenous community and grapples with questions of identity, cultural belonging, and the search for personal truth. Tim Winton's "Cloudstreet" explores ethical dilemmas, family dynamics, and societal change raising philosophical questions about morality, redemption, and the human capacity for compassion and forgiveness in the face of adversity. Richard Flanagan's "Gould's Book of Fish '' employs postmodern narrative techniques to explore cultural identity and colonial history. It challenges conventional storytelling, intertwining history, fiction, and satire to question power dynamics, truth, and the construction of identity. Australian literature's philosophical depth lies in its exploration of diverse themes, engaging with existential, cultural, environmental, and social issues unique to the Australian experience.

Some factors develop new philosophical views in a certain area and get penned down by the scholars.

1. Impact of Existentialism on Post-World War II Literature :

Existentialism, stemming from philosophers like Jean-Paul Sartre and Albert Camus, emphasised individual freedom, authenticity, and the absurdity of human existence. Post-World War II literature, for instance Samuel Beckett's "Waiting for Godot," reflected existential themes of alienation, meaninglessness, and the search for purpose in an absurd world.

2. Influence of Romanticism on Poetry and Prose :

Romanticism, inspired by Rousseau and emphasising emotion, nature, and individualism, shaped artistic expression and creativity. The Romantic movement impacted William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge in England, through their collection "Lyrical Ballads," which celebrated nature, emotions, and the individual's inner world, reflecting the Romantic ideals of emotional depth and connection with the natural world.

3. Impact of Structuralism and Post-Structuralism on Narrative Techniques :

Structuralism, introduced by Ferdinand de Saussure, discussed structures and systems of language. Post-Structuralism, advocated by Jacques Derrida and Michel Foucault, critiqued fixed meanings and questioned linguistic norms. These philosophical movements influenced narrative techniques. Authors like Italo Calvino, influenced by structuralism concepts, experimented with narrative forms in works like "If on a winter's night a traveller," challenging conventional storytelling. Post-Structuralist ideas influenced authors like Salman Rushdie, who incorporated metafiction and multiple perspectives in "Midnight's Children," questioning linear narratives and historical truths.

4. Impact of Enlightenment Ideals on Satirical Literature :

Enlightenment ideals of reason, scepticism, and social reform influenced literary satire. Satirical works like Voltaire's "Candide" critiqued societal norms, religious dogma, and political systems, satirising the contradictions between Enlightenment ideals and societal realities. The novella used humour and irony to challenge prevailing norms and advocate for intellectual inquiry and social progress.

The relationship between philosophy and literature has sparked ongoing debates and discussions among scholars, thinkers, and critics. Some argue that literature serves as a mirror, mirroring reality and providing a representation of life. Plato's critique of poetry as mere imitation falls under this view. Others contend that literature goes beyond mere imitation and offers insights, perspectives, and truths about human existence that transcend reality. Literature, they argue, adds value by provoking thought and emotions. Some emphasise literature's aesthetic value, valuing it for its beauty, creativity, and artistry. They focus on literary forms, language, and style as crucial elements. Contrarily, others argue for literature's ethical function, highlighting its role in conveying moral lessons, ethical dilemmas, and guiding human behaviour. Literature, they contend, shapes ethical understanding and consciousness. Some perspective advocates for the autonomy of both philosophy and literature, suggesting that they operate independently with distinct purposes and methods. Conversely, some argue for the instrumental role of literature in conveying philosophical ideas. They propose that literature serves as a vehicle to communicate complex philosophical concepts to a wider audience, making philosophy more accessible.

Some scholars focus on analysing literature through the lens of literary criticism, emphasising aspects like narrative structure, character development, and thematic analysis. Others engage in philosophical analysis of literature, examining it for its underlying philosophical themes, ethical dilemmas, and existential inquiries.

In both Europe and India, the modern approach to conjugating philosophy and literature involves innovative methods that intertwine these disciplines. Universities in Europe offer interdisciplinary programs that combine philosophy and literature. Courses like "Philosophy of Literature" or "Literary Ethics" explore the intersection between these disciplines, encouraging critical analysis and discussions. Similar interdisciplinary courses are gaining traction in Indian academic institutions, fostering a holistic understanding of philosophy and literature and their interconnections.

Scholars engage in comparative studies between European philosophical traditions and various literary movements, analysing how philosophical ideas manifest across different literary works. Postcolonial scholars in Europe examine the relationship between Western philosophical traditions and postcolonial literature, exploring the impact of colonisation on literary expressions. In India, there's a growing interest in comparative studies that juxtapose Indian philosophical concepts from Vedanta, Upanishads, or Bhagavad Gita with Western philosophical ideas, exploring their impact on Indian literature. Indian scholars employ decolonial approaches, analysing how Indian literature reflects resistance against colonial ideologies and incorporates indigenous philosophical concepts.

These modern approaches in Europe and India reflect a dynamic engagement between philosophy and literature, fostering interdisciplinary collaboration, comparative inquiries, and the exploration of philosophical themes within literary contexts. They aim to transcend traditional disciplinary boundaries, encouraging innovative dialogues and nuanced understandings of human experience, society, and culture.

The integration of philosophy and literature continues to evolve, fostering innovative approaches that intersect these disciplines. Scholars engage in interdisciplinary studies that fuse philosophy and literature, exploring comparative analyses of philosophical ideas across literary works from diverse cultures and time periods. Comparative studies between Western existentialist philosophy and Japanese literature, examining how themes of existential angst and human isolation manifest in Haruki Murakami's works like "Norwegian Wood" or "Kafka on the Shore," offer cross-cultural insights into existential concerns. Contemporary literature continues to explore existential themes, infusing philosophical concepts into narratives that reflect the complexities of modern existence. Zadie Smith's "White Teeth" or Mohsin Hamid's "The Reluctant Fundamentalist" incorporate existential dilemmas about identity, alienation, and the search for meaning in the contemporary globalised world, offering philosophical depth to their narratives.

Authors explore ethical dilemmas, moral quandaries, and ethical theories through fictional narratives, engaging readers in moral contemplation. Ian McEwan's "Atonement" grapples with moral responsibility, guilt, and the consequences of actions, prompting readers to ponder ethical complexities within the narrative, blurring the lines between ethics and storytelling. Postmodern literature continues to experiment with narrative forms, metafiction, and intertextuality, incorporating philosophical inquiries into the nature of reality, truth, and representation. David Mitchell's "Cloud Atlas" employs a fragmented narrative structure and interwoven storylines, inviting philosophical reflections on interconnectedness, identity, and the cyclical nature of human existence.

Digital humanities explore the integration of philosophy and literature through digital platforms, fostering innovative ways to present philosophical ideas within narratives. Interactive storytelling experiences or hypertext narratives, like "The Unknown" by Dirk Stratton, blend philosophical musings with reader interaction, allowing users to navigate and explore philosophical themes within the narrative.

Such current trends reflect the dynamic ways in which philosophy and literature are intertwineed with each other, offering diverse avenues for philosophical exploration within the realm of storytelling. The integration of these disciplines continues to evolve, fostering thought-provoking narratives that engage readers in philosophical contemplation while expanding the boundaries of literary expression.

One realizes God in proportion to the intensity of one's feeling for Him. He who is really eager to cross the ocean of the world will somehow break his bonds. No one can entangle him. The Master (Sri Ramakrishna) is the embodiment of all deities and of all mantras… Really and truly, one can worship through him all gods and goddesses.

– Sri Ma Sarada Devi

Fish Farming in Contai, West Bengal : A Thriving Industry

Suprakash Pal [Student, B.Ed. 1st Year]

Abstract :

This article explores the thriving fish farming industry in Contai, West Bengal, shedding light on its economic significance, cultivation techniques, challenges, and future prospects. Contai's advantageous geographic location near the Bay of Bengal has fostered an environment conducive to diverse aquaculture practices, making it a pivotal hub for fish farming in the region.

Introduction :

Nestled within the Purba Medinipur district of West Bengal, Contai boasts a flourishing fish farming industry that serves as a backbone for the local economy. Blessed with fertile lands and a climate conducive to aquaculture, the region has become a hotbed for cultivating various fish species.

The geographic advantage of being in close proximity to the Bay of Bengal provides an ideal setting for fish farming. Contai's water bodies, including ponds, lakes, and canals, offer a fertile ground for the cultivation of an extensive array of fish species, thereby establishing it as a prominent center for aquaculture.

This article delves into the multifaceted aspects of fish farming in Contai, touching upon the diverse cultivation techniques, economic significance, technological advancements, challenges faced by the industry, governmental support, and the promising future prospects that await this thriving sector.

Historical Context :

Fish farming in Contai, West Bengal, has a significant historical context within the larger scope of aquaculture development in India. West Bengal, known for its extensive freshwater resources, has a rich tradition of fish cultivation dating back centuries. The region's favorable climatic conditions and abundant water bodies have contributed to the growth of aquaculture, including fish farming.

In Contai specifically, the practice of fish farming likely has roots in traditional methods passed down through generations. The region's ponds, rivers, and wetlands have provided natural settings for rearing various fish species. Over time, advancements in aquaculture techniques, introduction of new fish breeds, government initiatives, and

technological innovations have contributed to the expansion and modernization of fish farming practices in Contai and surrounding areas.

The industry has witnessed changes in production methods, from traditional extensive farming to more intensive and semi-intensive methods, aimed at increasing yield and efficiency. Government support through schemes and subsidies has also played a role in promoting and sustaining the growth of fish farming in the region.

The historical context of fish farming in Contai, West Bengal, therefore, reflects a blend of traditional practices with modern advancements, driven by the region's natural resources, socio-economic factors, and technological developments in aquaculture.

Diversity in Fish Cultivation :

Contai, situated in West Bengal, boasts a rich and diverse landscape for fish cultivation. The region's aquatic resources and favorable climatic conditions have facilitated the cultivation of various fish species, contributing significantly to the local economy and dietary needs.

Rohu (Labeo rohita), Catla (Catla catla), Mrigal (Cirrhinus cirrhosus), and Tilapia are among the commonly cultivated fish species in Contai. These species thrive in the freshwater bodies prevalent in the region, including ponds, lakes, and even rice fields. The cultivation of these fish species is not only a means of livelihood but also addresses the protein requirements of the local population.

Moreover, Contai's fish cultivation practices often embrace innovative and sustainable methods, such as integrated fish farming. This technique combines fish rearing with agriculture, allowing for a symbiotic relationship between fish and crops. Farmers use the nutrient-rich water from fish ponds to irrigate fields, promoting better crop growth, while the fish benefit from increased water quality and supplemental feed sources from crop residues. This integrated approach not only diversifies the agricultural output but also enhances the overall productivity of both fish and crops.

Additionally, the region's pisciculture practices often involve traditional knowledge passed down through generations, complemented by modern techniques and technologies. This blend of traditional wisdom and contemporary methods contributes to the diversity and success of fish cultivation in Contai.

The significance of fish cultivation extends beyond economic gains. It plays a vital role in ensuring food security and nutrition for the local populace. Fish, being a rich source of protein and essential nutrients, contributes significantly to a balanced diet, particularly in areas where access to diverse protein sources might be limited.

In conclusion, Contai's diverse fish cultivation practices, encompassing various species and innovative techniques, not only support the local economy but also play a crucial role in providing sustainable food sources and enhancing agricultural productivity in the region.

Harvesting and Marketing :

Fish harvesting is done by using a net or draining away the entire volume of water. It should be noted that different species of food are obtained at different stages and weights. To get the most out of your food and provide your customers with quality fish, you need to make sure they are farmed properly and at the right time.

Fish marketing – Since doing business is actually looking at market trends and then making a profit, it is important to understand the business trend of agribusiness. Fish is considered a good source of vitamin D, omega-3, vitamin B2, and many more. Many people are giving up red meat for fish. This is an important reason why the raising of different aquatic species is a fast-growing sector. Most people eat fish. Research shows that about 500,000 people conclude that eating fish regularly increases a person's lifespan. This shows that you have a ready market. However, the goal is not to take the fish too far, as this will reduce your profit margins and the quality of the fish. Good quality fish will enable you to perform better than the competition. Like any other business, this is a business we should be marketing.

Market Availability :

Fish farming in Contai, West Bengal, has various market opportunities. The region's proximity to water bodies and favorable climatic conditions makes it suitable for fish cultivation. There's a growing demand for freshwater fish like Rohu, Catla, and Mrigal, which could be profitable options for fish farmers in Contai. Additionally, exploring market demand for specific varieties and establishing local connections could help in better understanding the market dynamics for fish farming in the region.

There are various market . Some main markets are Contai Supermarket, Majna Market, Nachinda bazar, Kalinagar fish market. The availability of fish in Contai Supermarket is significantly higher than the availability of fish Majna and Nachinda fish market. Again, the availability of fish in Kalinagar fish market is significantly higher than the availability of fish in Majna and Nnachinda fish market. But there is no significant difference in the availability of fish between Contai Supermarket and the Kalinagar fish market. For having this opportunities, local people can easily sell hervested fishes in this markets.

Socioeconomic Impact :

Fish farming in Contai, West Bengal, has wielded a profound socioeconomic influence. As a primary occupation for many locals, it has emerged as a critical source of livelihood,

offering employment opportunities and a steady income. The industry's growth has significantly reduced unemployment rates, particularly in rural areas, empowering individuals and communities.

Moreover, fish farming has bolstered food security by augmenting the availability of protein- rich sources, aiding in addressing malnutrition concerns. This surge in fish production has not only met local demands but has also facilitated trade, allowing for the export of surplus produce to neighboring regions, further boosting the local economy.

The positive socioeconomic implications extend beyond direct employment and food availability. The industry's growth has spurred the development of ancillary sectors such as transportation, packaging, and marketing, creating a ripple effect that generates additional jobs and economic opportunities. Overall, fish farming in Contai has played a pivotal role in enhancing the region's socioeconomic landscape, fostering economic growth, and empowering its residents.

Challenges and Future Prospects :

Fish farming in Contai, West Bengal, presents a promising yet challenging industry. The region's aquatic resources and favorable climate offer an excellent environment for fish cultivation. However, several hurdles hinder its potential growth.

Water quality management stands as a significant challenge. Contai's water bodies often face pollution from various sources, impacting the health of aquatic life. Additionally, disease outbreaks among fish populations pose a threat to farmers' livelihoods, requiring effective disease control measures and better veterinary support.

Access to finance and modern technology remains a concern for many local fish farmers. Lack of capital limits investments in infrastructure and innovative aquaculture techniques, hindering productivity and profitability. Furthermore, inadequate knowledge about modern farming practices and technological advancements hampers the industry's growth potential.

To address these challenges and bolster the future prospects of fish farming in Contai, several measures could be implemented. Improving water management through stricter regulations and community involvement could enhance water quality. Providing financial support, subsidies, and easy access to credit could assist farmers in adopting modern technology and infrastructure, thereby increasing efficiency and yield.

Moreover, offering training programs, workshops, and extension services on sustainable practices and disease management could empower farmers with necessary skills. Encouraging diversification into different species, promoting value addition, and strengthening market linkages would also create more opportunities and higher income for local fish farmers.

By addressing these challenges and implementing strategic interventions, Contai's fish farming industry could experience significant growth, ensuring sustainable livelihoods and contributing to the region's economic development.

Conclusion :

Fish farming in Contai, West Bengal, represents a thriving sector harnessing the region's conducive climate and abundant water resources. This industry has notably bolstered the local economy, offering livelihoods and catering to the escalating demand for fish in both regional and local markets. Despite these benefits, sustaining and enhancing this practice requires addressing key challenges. Effective water quality management, disease prevention strategies, and navigating market fluctuations are paramount. Tackling these issues would not only ensure the continued success of fish farming in Contai but also fortify its position as a crucial contributor to the socio-economic landscape of the region.

References :

1. Khan BA, Mandal B. 2021. Diversity of freshwater fishes in the eastern part of Purba Medinipur district of West Bengal. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies.

2. Bablu Ali Khan, Basudev Mandal. Availability and Conservation Status of Freshwater Fish in the Contai Sub-divisions of Purba Medinipur District, West Bengal, India.

3. www.wikipedia.com

4. www.agrifarming.in

You can safely walk on thorns with your shoes on; Shoed with spititual knowledge you can as safely roam over this thorny world.

– Sri Ramakrishna

Foundation History of ISRO

Soumen Maity [Student, B.Ed. 1st Year]

From carrying rocket parts on bicycle or bullock carts to reaching Mars in the first attempt or successfully landing on the South Pole of the Moon as the first country in the world shows India's progress in space science. The history of the journey behind the achievements that we see or feel proud of in the field of space today was not at all easy. And to tell the beginning of this journey, we can start from the year 1920 when many scientists of India started researching on space.The notable ones were Meghnad Saha, CV Raman etc. However, since independence, the curiosity about space has increased a lot among several Indians due to various reasons.

In the years after World War II, tensions between the United States and the Soviet Union were increasing as the two countries sought to establish themselves as global superpowers. As a result, the Cold War started between the two countries. So the two countries realized the need to launch rockets into outer space to use intercontinental ballistic missiles as nuclear weapons against each other. Because of that they became very active in developing space technology which resulted in the start of space race between the two countries. When the United States first announced in 1955 that it would launch artificial satellites into outer space, the event sparked the space race between the two countries. However, the Soviet Union went ahead in this space race by launching the world's first artificial satellite Sputnik I in 1957 and made history by becoming the first country in the world to reach space. In the same year, the Soviet Union successfully launched its second artificial satellite, Sputnik II. But in this mission they sent a dog named Laika into space. Following this success of the Soviet Union, America also successfully launched its first artificial satellite, Explorer-1, into space in 1958. And space technology was developing very fast at that time because of space race between these two countries.

Originally, the successful launch of Sputnik in 1957 and the development of space technology at that time, Dr. Vikram Sarabhai, India's eminent physicist and astronomer, deeply felt the importance of space technology for the development of the country. And that is why Dr. Vikram Sarabhai and Dr. Homi Jehangir Bhabha convinced the then Prime Minister of India Pandit Jawaharlal Nehru to develop his own space program and invest in the space sector for the development of the country. Initially, Prime Minister Nehru entrusted the task of space research and outer space exploration to the Department of Atomic Energy, headed by senior nuclear physicist Homi Jehangir Bhabha. Here we all know that Homi Jehangir Bhabha is known as 'Father of Indian Atomic Energy'. Then,

Dr. Homi Bhabha established the Indian National Committee for Space Research (INCOSPAR) in 1962 with another brilliant scientist Dr. Vikram Sarabhai as its Chairman. India's space technology and infrastructure was not at all good at the time when INCOSPAR was formed in India. Besides, in 1962 India's internal and economic situation was completely weakened due to the humiliation at border clash with China. Inspite of such multiple obstacles at that time, the formation of INCOSPAR under the leadership of Prime Minister Nehru, Dr. Bhabha and Dr.Sarabhai to develop India's space technology can be summed up in a famous quote by Oscar Wilde.

"We are all in the gutter, but some of us are looking at stars" - Oscar Wilde.

After the formation of INCOSPAR, it signed an agreement with NASA for the 'Nike-Apache' sounding rocket under the leadership of Dr. Vikram Sarabhai. After that, Vikram Sarabhai traveled around the country to build the launching station required for the successful launch of this rocket but he didn't find the proper place. Then he reached Thumba, a small fishing village in Thiruvananthapuram, Kerala. While visiting St. Mary Magdalene Church of Thumba, he noticed that the church was located on the magnetic equator and the village was nearby to the geographic equator, so he considered the place perfect for a launching station. Vikram Sarabhai and his associates, with the help of the bishop and the villagers, were able to use the church and the bishop's house as a rocket designing and assembling center, an engineering workshop, and an open space laboratory. Thus gradually all villages became 'Thumba Equatorial Rocket Launching Station.' From the very beginning, Vikram Sarabhai's aim was to improve the space technology of the country, for that purpose all the scientists were working very hard under his supervision. For this reason, despite the poor condition of the country at that time, poor economy, lack of infrastructure, lack of resources and various other factors, we saw how our country's scientists carried the rocket parts from different places to the launching station by bicycles and bullock carts to launch the country's first rocket. And as a result of this effort India successfully launched the first sounding rocket 'Nike-Apache' into space on 21st November in 1963 at 6:25 PM exactly one year after the establishment of INCOSPAR. This rocket was launched to take various measurements, one of the most important of which is to study electrons in the Earth's atmosphere. After the success of 'Nike-Apache', Indian scientists gained a lot of experience and learned a lot and then India developed their own sounding rocket 'Rohini-75' and successfully launched it on 20th November in 1967. Thus, under the leadership of Vikram Sarabhai, India step by step started to develop in space technology.

On August 15th in1969, on the country's 22nd Independence Day, ISRO was formed under the Indira Gandhi government to rename INCOSPAR and once again Dr.Vikram Sarabhai was appointed as its chairman. After the formation of ISRO, under the supervision

of Vikram Sarabhai, Indian scientists began working and researching on their first artificial satellite. But unfortunately, Dr. Vikram Sarabhai died of cardiac arrest in 1971, just two years after the formation of ISRO and he could not see the success of the great work of indigenous artificial satellite development that had begun under his supervision. Initially, ISRO was placed under the Department of Atomic Energy(DAE), but keeping in mind the importance and contribution of Dr. Vikram Sarabhai in Indian space technology development, after his death, the Indian Government established a separate department called Department of Space(DOS) in 1972. That's why Dr. Vikram Sarabhai is known as 'Father of Indian Space Program' to us. After the death of Dr. Vikram Sarabhai, the next chairman of ISRO, Dr. Satish Dhawan, took over the entire responsibility of ISRO besides filling the void created in ISRO. Dr. Satish Dhawan was an extremely talented mathematician and aerospace scientist of India. India's first satellite 'Aryabhata' designed and fabricated in India by ISRO under the supervision of Professor Satish Dhawan was successfully launched by a Soviet Kosmos-3M rocket on April 19, 1975.

Then, India made its own Satellite Launch Vehicle 'SLV-3' and using of this launch vehicle 'Rohini' became the first satellite to be placed in the orbit in 1980 and the director of this project was Dr. APJ Abdul Kalam. After that, ISRO developed other launch vehicles such as PSLV(Polar Satellite Launch Vehicle),GSLV(Geosynchronous Satellite Launch Vehicle). PSLV is used for launching satellites into polar orbits and GSLV is used for launching satellites into geostationary orbits. The 1980s and 1990s were characterized by a series of successful satellite launches, contributing to India's communication and meteorological infrastructure. ISRO's commitment to cost-effectiveness and frugality became evident during this period.

In 2008, ISRO achieved global recognition with the Chandrayaan-1 mission, India's first lunar probe. Chandrayaan-1 made significant discoveries, including the presence of water molecules on the lunar surface. This marked India's entry into interplanetary exploration and showcased ISRO's growing prowess in space science. The Mars Orbiter Mission (Mangalyaan), launched in 2013, further solidified India's position on the global space stage. Mangalyaan not only made India the first Asian nation to reach Mars orbit but also the first in the world to do so in its maiden attempt, showcasing ISRO's technical acumen and project management skills.

ISRO's achievements extend beyond space exploration, with a strong emphasis on societal applications. The organization's contributions to telemedicine, tele-education, and disaster management underscore its commitment to leveraging space technology for the benefit of humanity. International collaborations have played a crucial role in ISRO's success. The organization has engaged in partnerships with various countries and space agencies, fostering knowledge exchange and collaboration on joint missions. These

collaborations have enhanced India's importance in the global space community. In recent years, ISRO has continued to push boundaries with ambitious projects such as the Gaganyaan mission, aimed at sending Indian astronauts to space. The organization's focus on research and development, coupled with a strategic approach to space exploration, positions India as a key player in shaping the future of space activities.

In conclusion, the foundation history of ISRO is a testament to India's determination to embrace space technology for national development. From the early vision of Dr. Vikram Sarabhai to the contemporary achievements in interplanetary exploration, ISRO's journey reflects a remarkable blend of scientific vision, technological innovation, and national commitment. The organization's legacy extends beyond its technical accomplishments; it symbolizes India's aspirations to explore new frontiers, contribute to global scientific knowledge, and harness space technology for the greater good.

References :

isro.govt.in; Wikipedia; StudyIQ IAS; EPICPEDIA-Unknown Facts Of India; The Secrets of the Universe; Dhrub Rathee.

Whatever you think, that you will be. If you think yourselves weak, weak you will be; if you think yourselves strong, strong you will be.

– Swami Vivekananda

Sugar : The Silent and Invisible Killer

Subhadeep Porel **[Student, B.Ed. 1st Year]**

Introduction :

In the modern era, the prevalence of diabetes and obesity has reached concerning levels, forming a dark shadow over public health worldwide. While several factors contribute to these health issues, one of the major culprits is the consumption of excessive sugar. The high prevalence of sugar in our diets, often hidden in processed foods and beverages, has led to a concerning rise in several chronic health conditions. This article delves into the intricate relationship between sugar consumption, diabetes, and obesity, exploring the scientific evidence that highlights the detrimental effects of our sweet tooth on our well-being.

The Sugar Epidemic :

Over the past few decades, there has been a detrimental shift in dietary habits, characterized by a huge increase in the consumption of processed and sugary foods. The World Health Organization (WHO) recommends that added sugars should account for less than 10% of total daily caloric intake, but unfortunately, many individuals far exceed this limit. The average American, for instance, consumes approximately **49 grams** of added sugars daily, significantly more than the maximum amount of **36 grams** per day.

The Impact of Sugar on Blood Sugar Levels :

Sugar is a collective term for various sweeteners, including sucrose, fructose, and glucose, all of which contribute to the sweet taste of different foods. When we consume sugar, our bodies degrade it down into glucose, a simple form of sugar. Glucose enters the bloodstream and causes an increase in blood sugar levels. The body has mechanisms to regulate and maintain blood sugar levels. However, the excessive consumption of sugar affects these systems, leading to a surge in insulin production.

Insulin is an essential hormone produced by the pancreas. It aids the cells in absorbing glucose for energy. However, constant exposure to high sugar levels can result in insulin resistance, where the cells of the body become less responsive to insulin. This resistance forces the pancreas to produce even more insulin to maintain normal blood sugar levels. Over time, the pancreas struggles to keep up with the demand, leading to elevated blood sugar levels. This condition is known as hyperglycemia, a precursor to **type 2 diabetes**.

The Diabetes Connection :

Type 2 diabetes is characterized by insulin resistance and impaired insulin secretion. It is strongly linked to **lifestyle factors**, including **diet**. The surge in sugar consumption has been identified as a major contributor to the rising incidence of type 2 diabetes. Numerous studies have established a direct relationship between high sugar intake and the risk of developing diabetes, emphasizing the need for dietary interventions to mitigate this risk.

The Glycemic Index and Diabetes Risk :

Not all sugars are created equal, and the glycemic index (GI) measures how quickly a particular food raises blood sugar levels. **High-GI foods, such as sugary cereals and candies are mostly consumed by children as breakfast**. They cause a rapid spike in blood sugar levels, causing additional stress on the body's insulin response. Prolonged exposure to high-GI foods has been associated with an increased risk of type 2 diabetes. Conversely, low-GI foods, like whole grains and legumes, release glucose gradually, providing a more stable and sustainable source of energy with a **very low risk** of developing **diabetes**.

The Role of Added Sugars in Diabetes :

Beyond the natural sugars present in fruits and vegetables, the excessive consumption of added sugars poses a significant threat to metabolic health. Added sugars are prevalent everywhere today. They are in sugary beverages such as **soft-drinks, packaged fruit juices, energy drinks**, baked items such as **biscuits, cakes** and processed foods such as **ice creams**. They contribute **empty calories** devoid of essential nutrients. These sugars not only **elevate blood sugar** levels but also **promote weight gain**, which is a key risk factor for insulin resistance and diabetes.

Obesity : A Consequence of Excessive Sugar Intake :

The link between sugar consumption and obesity is well-established. High-sugar diets contribute to weight gain through several mechanisms. Firstly, sugary foods are calorie-dense, and excess calories are stored as fat. Secondly, the insulin resistance associated with daily & high sugar consumption hampers the ability of the body to utilize glucose for energy, leading to increased fat storage. Moreover, the sugary beverages are in **liquid form**. So the consumption of such drinks **does not make us feel full** which results in **more consumption**. On average, a 355 ml can of soft drink contains about **39 grams** of sugar, which is equivalent to about 9 teaspoons. The **maximum** recommended amount of daily consumption is **36 grams** of sugar per day.

The Impact of Sugar on Appetite Regulation :

Beyond its direct contribution to calorie intake, sugar may also influence appetite regulation, promoting **overeating**. High-sugar diets have been linked to dysregulation of hormones that control hunger and satiety, such as leptin and ghrelin. Leptin signals to the brain that the body has enough energy stores, implementing a feeling of fullness. However, **chronic sugar consumption** can lead to leptin resistance, disrupting this mechanism. This contributes to overeating.

The Role of Fructose in Metabolic Dysfunction :

Glucose is a primary source of energy for the body. Fructose, another component of sugar, is broken down (metabolized) differently. Unlike glucose, which is metabolized in various tissues, fructose is primarily metabolized in the liver. Excessive fructose is present in high-fructose corn syrup (HFCS), which is found in many **processed foods** and **sugary beverages**. It has been linked to liver fat accumulation, insulin resistance, and an increased risk of metabolic syndrome—a cluster of conditions that includes obesity, high blood pressure and abnormal cholesterol levels.

The Hidden Sugars: Unmasking the Culprits :

One of the challenges in addressing the sugar-health connection lies in the abundance of **hidden sugars** in processed foods. **Manufacturers often add sugars** to enhance flavour, texture, and shelf life, making it challenging for consumers to identify and limit their intake. Terms such as **sucrose**, **high-fructose corn syrup**, **agave nectar**, and **maltose** may appear innocuous, but they all contribute to the overall sugar content of a product. Nutrition labels often list these sugars under different names. This requires consumers to be vigilant and informed.

Some unusual names of sugar that are currently used in product labelling are mentioned below :–

Type of sugar	Alternative names
Cane sugar	Blackstrap molasses Brown sugar Cane juice/sugar/extract Caster sugar Coffee sugar crystals Demerara sugar Golden syrup Icing sugar Invert sugar

Type of sugar	Alternative names
Cane sugar	Molasses Panela Rapadura Raw sugar Treacle Turbinado sugar White sugar
Fruit	Date sugar/syrup Fruit juice concentrate Fruit juice/sugar Grape sugar/syrup
Corn	Corn syrup/sugar Glucose syrup High fructose corn syrup
Alternative Sweeteners	Agave Barley malt syrup Brown rice syrup Coconut sugar Date sugar Honey Malt extract Maple syrup Palm sugar Rice malt syrup
Chemical names	Glucose Dextrose (another name for glucose) Fructose (fruit sugar) Lactose (milk sugar) Maltose (malt sugar) Sucrose

Addressing the Crisis : Public Health Initiatives and Personal Responsibility

Public health initiatives aimed at raising awareness and promoting healthier dietary choices are crucial. These initiatives can include educational campaigns, clearer food labelling, and **regulations on the marketing of sugary products, especially to children**.

In addition to public health efforts, individuals play a pivotal role in curbing the sugar epidemic. **Making informed food choices**, **reading nutrition labels**, and **opting for whole, unprocessed foods** can significantly reduce sugar intake. Behavioural changes, such as minimizing the consumption of sugary beverages and desserts, can have a positive impact on both weight management and metabolic health.

Conclusion :

The modern epidemic of diabetes and obesity is intricately linked to the widespread consumption of sugar. From its impact on blood sugar levels and insulin resistance to its role in promoting weight gain and overeating, sugar emerges as a major contributor to these health conditions. **Recognising** the **hidden sugars** in processed foods and adopting a balanced, diet based on **whole foods** are crucial steps in mitigating the impact of sugar on our health.

As we navigate the complex relationship between sugar consumption, diabetes, and obesity, it is important to prioritize informed choices and advocate for policies that promote healthier dietary patterns. By addressing the sweet menace at both individual and societal levels, we can work towards a healthier future, reducing the burden of such diseases and well-being for generations to come.

References :

Dasgupta, R., Pillai, R., Kumar, R. and Arora, N.K., 2015. Sugar, salt, fat, and chronic disease epidemic in India : is there need for policy interventions ? Indian Journal of Community Medicine : Official Publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine, 40(2), p.71. https://doi.org/10.4103%2F0970-0218.153858

World Health Organization, 2015. Guideline : sugars intake for adults and children. World Health Organization. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK285538/

Bray, G. A. and Popkin, B.M., 2014. Dietary sugar and body weight: have we reached a crisis in the epidemic of obesity and diabetes? Health be damned! Pour on the sugar. Diabetes care, 37(4), pp.950-956. https://doi.org/10.2337/dc13-2085

Johnson, R. J., Segal, M.S., Sautin, Y., Nakagawa, T., Feig, D.I., Kang, D.H., Gersch, M.S., Benner, S. and Sánchez-Lozada, L.G., 2007. Potential role of sugar (fructose) in the epidemic of hypertension, obesity and the metabolic syndrome, diabetes, kidney disease, and cardiovascular disease. The American journal of clinical nutrition, 86(4), pp.899-906.

Taylor, L. A. and Rachman, S.J., 1988. The effects of blood sugar level changes on cognitive function, affective state, and somatic symptoms. Journal of Behavioral Medicine, 11, pp.279-291.
https://doi.org/10.1007/BF00844433

Tseng, T. S., Lin, W.T., Gonzalez, G.V., Kao, Y.H., Chen, L.S. and Lin, H.Y., 2021. Sugar intake from sweetened beverages and diabetes: a narrative review. World Journal of Diabetes, 12(9), p.1530.
https://doi.org/10.4239%2Fwjd.v12.i9.1530

Schillinger, D., Tran, J., Mangurian, C. and Kearns, C., 2016. Do sugar-sweetened beverages cause obesity and diabetes? Industry and the manufacture of scientific controversy. Annals of Internal Medicine, 165(12), pp.895-897.
https://doi.org/10.7326/L16-0534

Colley, D. L. and Castonguay, T.W., 2015. Effects of sugar solutions on hypothalamic appetite regulation. Physiology & behavior, 139, pp.202-209.
https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2014.11.025

Erlanson Albertsson, C., 2005. How palatable food disrupts appetite regulation. Basic & clinical pharmacology & toxicology, 97(2), pp.61-73.
https://doi.org/10.1111/j.1742-7843.2005.pto_179.x

Larson-Meyer, D. E., Willis, K.S., Willis, L.M., Austin, K.J., Hart, A.M., Breton, A.B. and Alexander, B.M., 2010. Effect of honey versus sucrose on appetite, appetite-regulating hormones, and postmeal thermogenesis. Journal of the American College of Nutrition, 29(5), pp.482-493.
https://doi.org/10.1080/07315724.2010.10719885

Nakagawa, T., Hu, H., Zharikov, S., Tuttle, K.R., Short, R.A., Glushakova, O., Ouyang, X., Feig, D.I., Block, E.R., Herrera-Acosta, J. and Patel, J.M., 2006. A causal role for uric acid in fructose-induced metabolic syndrome. American Journal of Physiology-Renal Physiology, 290(3), pp.F625-F631.
https://doi.org/10.1152/ajprenal.00140.2005

Lim, J.S., Mietus-Snyder, M., Valente, A., Schwarz, J.M. and Lustig, R.H., 2010. The role of fructose in the pathogenesis of NAFLD and the metabolic syndrome. Nature reviews Gastroenterology & hepatology, 7(5), pp.251-264.
https://doi.org/10.1038/nrgastro.2010.41

Tappy, L., Lê, K.A., Tran, C. and Paquot, N., 2010. Fructose and metabolic diseases : new findings, new questions. Nutrition, 26(11-12), pp.1044-1049.
https://doi.org/10.1016/j.nut.2010.02.014

The present Governing Body of the College

1.	**Hon'ble Mr. Justice Pinaki Chandra Ghose**	Retd. Judge, Supreme Court (Former Lokpal of India)	***President*** of the Governing Body
2.	**Swami Jayananda**	Secretary of Ramakrishna Mission Boys' Home, Rahara	***Secretary*** of the Governing Body
3.	**Swami Nirishananda**	Principal (Actg.) of Ramakrishna Mission Brahmananda College of Education, Rahara	***Asst. Secretary & Ex-Officio*** of the Governing Body
4.	**Swami Kaivalyananda**	Asst. Secretary of Ramakrishna Mission Boys' Home, Rahara	***Member*** of the Governing Body
5.	**Swami Kamalasthananda**	Principal of Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, Rahara	***Member*** of the Governing Body
6.	**Swami Muralidharananda**	Headmaster of Ramakrishna Mission Boys' Home High School, Rahara	***Member*** of the Governing Body
7.	**Swami Vedanuragananda**	Controller of Examinations of Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, Rahara	***Member*** of the Governing Body
8.	**Dr. Sanjiban Sengupta**	WBES, Associate Professor of Govt. Training College, Hooghly. Former JDPI, Govt. of West Bengal	***Member*** of the Governing Body (Government Representative)
9.	**Dr. Subir Nag**	Principal of Satyapriya Roy College of Education, Salt Lake, Kolkata-700064	***Member*** of the Governing Body (University Representative)
10	**Dr. Subrata Biswas**	Assistant Professor of Ramakrishna Mission Brahmananda College of Education, Rahara	***Member*** of the Governing Body (Teacher Representative)

Our Faculties

HOI : **Swami Nirishananda**	**Principal (Actg.)**
TEACHERS : **Dr. Kousik Chattopadhyay**	M.A. (Bengali), P.G.B.T., M.Ed., Ph.D. - **Associate Professor**
Dr. Malayendu Dinda	M.A. (English), D.E.L.T., P.G.C.T.E. & P.G.D.T.E., M.Ed., M.Phil., Ph.D. - **Associate Professor**
Dr. Sanjoy Mitra	M.P.Ed., Ph.D., D.N.H.E., D.Y.E. - **Assistant Professor**
Dr. Prosenjit Mandal	M.Sc. (Zoology), M.A. (Education), M.Ed., M.Phil. (Education), Ph.D. - **Assistant Professor**
Dr. Subrata Biswas	M.Sc. (Physics), P.G.D.G.P.C. & F.T., P.G.D.H.R. & D.E., M.A. (Education), M.Ed., Ph.D. - **Assistant Professor**
Prof. Miltan Biswas	M.Sc. (Geography), Certificate Course in Remote Sensing & GIS, M.Ed., M. Phil. (Geography) - **Assistant Professor**
Prof. Abdus Safi	M.Sc. (Mathematics), M.Ed. - **Assistant Professor**
Dr. Samrat Bisai	M.A. (English), M.Ed., Ph.D. - **Assistant Professor**
Dr. Tusher Kanti Halder	M.A. (English), M.A. (Education), M.Ed., P.G.D.G.P.C. & F.T., Ph.D. - **Assistant Professor**
Prof. Manorajan Pal	M.A. (History), M.Ed., P.G.D.G.C. - **State Aided College Teacher** (SACT-II)
LIBRARY : **Sri Tapas Biswas**	M.Sc. (Zoology), M.L.I.S., B.T. - **Librarian**
OFFICE : **Sri Abhishek Samanta**	M.Sc. (Mathematics) - **Accountant**
Sri Suvojit Chakraborty	B.Com. (Hons.) - **Clerk**
Sri Sanjay Gharai	**Group-D Staff**
HOSTEL (non-teaching staff) : **Sri Bijoy Krishna Mandal**	

List of B.Ed. Students for the Session : 2023-25

Name : Kalosona Mondal
Date of Birth : 08/04/1999
Method Paper : History
Qualification : M.A.
Address : Canning
District : South 24 PGS
Pin: 743329
Email : kalosonamondal2001@gmail.com
Contact:7439429812; Blood Gr.: B+

Name : Tapas Pal
Date of Birth : 27/10/1999
Method Paper : Education
Qualification : M.A.(Education)
Address :Vill-Ruisahar
P.O - Shyamnagar, P.O.-Joypur
District : Bankura; Pin : 722138
Email : paltapas971@gmail.com
Contact: 9093528642; Blood Gr.: A+

Name : Subhadeep Porel
Date of Birth: 13/03/2000
Method Paper : Life Science
Qualification : M. Sc. (Microbiology)
Address : 4, Madhu Pal Lane,
Kumartuli
District : Kolkata; Pin: 700005
Email: subhadeep.porel.2000@gmail.com
Contact :7998709805;
Blood Gr. : AB+

Name : Baijayanta Majumder
Date of Birth : 19/09/1997
Method Paper : HISTORY
Qualification : M.A. (History), UGC-NET (LS, History, 2022), WB-SET (2023, History)
Address : I/D-09 Kustia Govt. Housing Estate, Picnic Garden Road, P.O+P.S - Tiljala
District : South 24 PGS; Pin: 700039
Email : baijayantamajumder.kolkata@gmail.com
Contact : 8240793196;
Blood Gr. : O+

Name : Sayandip Jana
Date of Birth : 30.11.1999
Method Paper : Life Science
Qualification : M.Sc. (Microbiology)
Address :Vill-Sastanagar,
P.O+P.S- Dantan
District : Paschim Medinipur;
Pin : 721426
Email : sayandip582@gmail.com
Contact: 7001382852; Blood Gr.: A+

Name : Sahishnu Biswas
Date of Birth : 08/04/1999
Method Paper : Geography
Qualification : M.Sc.
Address : 302, Sunit Banerjee Road,
Old Post Office , Ghola , Sodepur
District : North 24 PGS; Pin: 700111
Email : sahishnu08@gmail.com
Contact : 8777078978
Blood Gr.: O+

Name : Karan Kumar Rabi Das
Date of Birth : 01/07/2001
Method Paper : Geography
Qualification : M.Sc in Geography,
UGC-NET Qualified
Address: 14 No.Gwalapara Road Bhatpara, PS & PO - Bhatpara
District : North 24 PGS; Pin : 743123
Email: karankumarrabidas123@gmail.com
Contact : 8585805254; Blood Gr.: O+

Name : Aditya Panda
Date of Birth : 18/05/ 2000
Method Paper : English
Qualification : M.A. (English)
Address : 7 B.T. Road, PO. Talpukur
District : Kolkata; Pin : 700123
Email : adityapanda193@gmail.com
Contact : 8017608578
Blood Gr. : O+

Name : Arindam Biswas
Date of Birth : 10/07/2002
Method Paper : Mathematics
Qualification : B. Sc. Math (H)
Address : Vill-Chinipukur (Rampur),
P.O- Sonepur, P.S.- Kashipur
District : South 24 pgs; Pin : 700135
Email : arindambiswas441@gmail.com
Contact : 7076737325
Blood Gr. : O+

Name : Rick Mahanty
Date of Birth : 04/04/2001
Method Paper : Mathematics
Qualification : M.Sc. (Math)
Address : Vill+P.O.- Parardanga,
P.S.- Taldangra
District : Bankura; Pin : 722152
Email: rick.mahanty2017@gmail.com
Contact : 7872088227
Blood Gr. : O+

List of B.Ed. Students for the Session : 2023-25

Name : Suprakash Pal
Date of Birth : 09/10/2000
Method Paper : Mathematics
Qualification : M.Sc. (Math)
Address : Vill- Chhanberia,
P.O- Ghoraghata, P.S.- Contai
District : Purba Medinipur; Pin: 721427
Email : suprakashpal01@gmail.com
Contact : 6295849490; Blood Gr. : O+

Name : Subhankar Maji
Date of Birth : 06/02/1999
Method Paper : Mathematics
Qualification : M. Sc(Math)
Address : Vill+P.O-Alinan, P.S-Tamluk
District : Purba Medinipur Pin : 721137
Email : mailtosubhankar.math@gmail.com
Contact : 8777068489
Blood Gr. : A+

Name : Meraj Hussain Ansari
Date of Birth : 20/02/2000
Method Paper : English
Qualification : M.A.
Address : 166/D M C Mitra Road,
P.O.: Hazinagar, P.S.: Halisahar
District: North 24 Parganas; Pin: 743135
Email: merajhussainansari3@gmail.com
Contact: 8777610750; Blood Gr.: A+

Name : Miraj Ali Molla
Date of Birth : 09/05/2000
Method Paper : History
Qualification : M.A.
Address : Vill+P.O.+P.S-Matia
District : North 24 PGS
Pin: 743437
Email : mirajalimolla3@gmail.com
Contact : 7029135796

Name : Gour Sutradhar
Date of Birth : 04/11/2000
Method Paper : Bengali
Qualification : M.A. (Bengali)
Address : Vill- Thinagar,
Post-Pakuahat, PS-Bamangola
District : Malda; Pin : 732138
Email: goursutradhar096@gmail.com
Contact : 7718688243; Blood Gr.: B+

Name : Pradyut Mahato
Date of Birth : 15/03/1999
Method Paper : History
Qualification : M.A.
Address : Vill-ketlapur, Post-Rukni
District : Purulia, Pin: 723145
Email: Pradyutmahato1999@gmail.com
Contact : 8436111421
Blood Gr. : B+

Name : Maloy Bag
Date of Birth : 30/03/2000
Method Paper : Physical Science
Qualification : M.Sc. (Physics),
DCA (Computer)
Address : Deriachak P. Mahal,
Deriachak, Kolaghat
District: Purba Medinipur, Pin: 721151
Email: malaoybag@gmail.com
Contact : 7865976768

Name : Nityananda Kunui
Date of Birth : 06/04/2000
Method Paper : Education
Qualification : M.A.
Address : Vill.-Gohalara P.O-Genrai
P.S.-Ausgram
District : Purba Bardhaman
Pin : 713152
Email: biplobkunui14@gmail.com
Contact : 7679552062; Blood Gr.: B+

Name : Priyankar Sardar
Date of Birth : 18/03/2000
Method Paper : History
Qualification : M.A.
Address : Brindakhali,
P.O – Brindakhali, P.S – Baruipur
District : South 24 PGS, Pin : 743387
Email : priyo.sardar2016@gmail.com
Contact : 8961587707

Name : Bikram Pahari
Date of Birth : 10/05/1994
Method Paper : Bengali
Qualification : M.A. (Philosophy)
Address : Chakbandy Colony, Kotwali,
English Bazar
District : Malda
Pin : 732144
Email : paharibikram425@gmail.com
Contact:7479154494; Blood Gr.: B+

List of B.Ed. Students for the Session : 2023-25

Name : Souvik Dalui
Date of Birth : 25/10/2000
Method Paper : Life Science
Qualification : M.Sc. (Botany)
Address : Ichapur, Garbalia,
Jagatballavpur
District : Howrah; Pin : 711410
Email: souvikdalui506@gmail.com
Contact: 6296550549; Blood Gr.: B+

Name : Shuvankar saha
Date of Birth : 31/08/1998
Method Paper : Geography
Qualification : M.A. (Geography)
Address : Sodepur, Milangarh,
P.O - Natagarh, P.S - Ghola
District : North 24 PGS; Pin : 700113
Email: Shuvankarsaha1998@gmail.com
Contact: 8583038241; Blood Gr. : B+

Name : Subha Paramanick
Date of Birth : 23/07/1999
Method Paper : Education
Qualification : M.A.
Address : Vill-Jotgiri,
P.O-Lakshmanpur, P.S.-Domjur
District : Howrah; Pin : 711114
Email: subhaparamanick1990@gmail.com
Contact: 9007957211; Blood Gr.: B+

Name : Soubhik Kundu
Date of Birth : 09/12/1998
Method Paper : English
Qualification : M.A. (English), B.L.I.S.
Address : 24, Mala Para Road,
P.O- Athpur
District: North 24 Parganas,
Pin : 743128
Email : soubhik98kundu@gmail.com
Contact : 6290159774; Blood Gr. : B+

Name : Anjan Sarkar
Date of Birth : 28/09/1999
Method Paper : History
Qualification : M.A. (History); WB - SET
Address : Uttar Gobindapur, Patrasayer
District : Bankura
Pin : 722206
Email : sarkaranan022@gmail.com
Contact : 9641401151

Name : Manas Mondal
Date of Birth : 03/02/1998
Method Paper : Bengali
Qualification : M.A.
Address : VILL+PO+PS - BASANTI
District : South 24 Parganas
Pin : 743312
Email : mm8187489@gmail.com
Contact : 8777504234
Blood Gr.: A+

Name : Kartik Dolai
Date of Birth : 18/07/2000
Method Paper : Education
Qualification : M.A. (Education)
(UGC-NET, WB-SET)
Address : Vill- Satgerya, Po- Panchkhuri,
P.S- Kotwali
District : Paschim Medinipur; Pin: 721150
Email : kdolai604@gmail.com
Contact : 7319233753; Blood Gr. : B+

Name : Monojit Paul
Date of Birth : 12.01.2001
Method Paper : English
Qualification : M.A. (English)
Address : 6/16/2 Dumdum Road.
P.O - Ghughudanga, P.S- Cossipore
District : Kolkata; Pin : 700030
Email : paulmonojit.12@gmail.com
Contact : 7003203184; Blood Gr.: B+

Name : Soumen Maity
Date of Birth : 04/02/2000
Method Paper : Physical Science
Qualification : M.Sc (Physics),
CCA(Basic Python), Project(2D Material)
Address : Vill - Nijkhayra,
P.O - Narayanchak, P.S - Kolaghat
District : Purba Medinipur; Pin: 721154
Email : sm.maity99@gmail.com
Contact : 8695734821; Blood Gr. : B+

Name : Bipal Mondal
Date of Birth : 18/04/1997
Method Paper : Life science
Qualification : M.Sc. in Botany; CSIR
UGC-NET 2023, GATE 2023, WB-SET 2023
Address : Vill+P.O-Bamanagar,
Police Station - Kakdwip
District : 24 Pgs. (S), Pin : 743347
Email: bipalmondal1997@gmail.com
Contact: 7586955445; Blood Gr.: O+

List of B.Ed. Students for the Session : 2023-25

Name : Sovaram Murmu
Date of Birth : 25/05/1999
Method Paper : Geography
Qualification : B.Sc (Geography Honours), D.El.Ed, WB-TET
Address : Vill-Kadadiha, P.O-Muramouli P.S-Raipur
District : Bankura ; Pin : 721504
Email : sovaram61@gmail.com
Contact : 7908220618

Name : Sarforaj Ahamed
Date of Birth : 29/06/2001
Method Paper : Geography
Qualification : B.Sc. Geography (H)
Address : Vill - Hamidpur , P.O - Kuliagarh, P.S - Amdanga
District: North 24 Parganas; Pin: 743166
Email : sarforajahamed61@gmail.com
Contact : 6290910335; Blood Gr. : A+

Name : Saurav Mondal
Date of Birth : 11.08.2000
Method Paper : Geography
Qualification : B.Sc. Geography (H)
Address : Vill - Prasadpur, P.O-Kustia, P.S- Sonarpur
District : South 24 PGS; Pin : 743330
Email : sauravprasadpur@gmail.com
Contact: 8597838083; Blood Gr. : O+

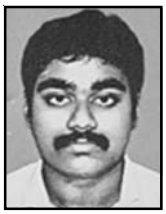

Name : Niladri Chatterjee
Date of Birth : 04/03/2000
Method Paper : English
Qualification : M.A. (ENG)
Address : 450/4 Ashok Nagar, P.O + P. S Ashok Nagar
District : 24 Pgs (N); Pin: 743222
Email: chatterjee.niladri450@gmail.com
Contact : 8436367692; Blood Gr. : A+

Name : Prasenjit Pramanik
Date of Birth : 20/02/2001
Method Paper : Education
Qualification : M.A. in Education (UGC-NET and WB-SET Qualified)
Address : Vill- Olui , P.O - Puichara, P.S- Goaltore
District: Paschim Medinipur; Pin: 721157
Email: prasenjitpramanik815@gmail.com
Contact: 6295825950; Blood Gr.: A+

Name : Meherul Sardar
Date of Birth : 29/04/1999
Method Paper : Geography
Qualification : M.Sc. (Geography), Master of Population Studies(MPS)
Address : Himchakhali, Matherdighi, Jibantala, Canning-II
District: 24-Pgs. (S); Pin: 743329
Email: meherulsardar2@gmail.com
Contact: 9088885908; Blood Gr.: A+

Name : Khayrul Hasan Shaikh
Date of Birth : 04/02/1999
Method Paper : Mathematics
Qualification : M.Sc. Math (Pure)
Address : Vill + P.O: Agarhati, P.S-Nazat
District : North 24 PGS; Pin: 743329
Email : khayrulmath@gmail.com
Contact : 7430082286

Name : Sayantan Biswas
Date of Birth : 20/03/1994
Method Paper : Physical Science
Qualification : B.Sc. (Chemistry), D.L.Ed, Diploma in Pharmaco Vigilance
Address : Vill+P.O+P.S - Palashipara
District : Nadia; Pin : 741155
Email: sayantan.chemist@gmail.com
Contact: 8918420752; Blood Gr.: O+

Name : Sk Rakibul Haque
Date of Birth:10/06/1992
Method Paper : Physical Science
Qualification : B.Sc. (Chemistry)
Address : Ghoshpur, Khanakul
District : Hooghly
Pin : 712613
Email : mailtorakibul@gmail.com
Contact : 9732183225, Blood Gr. : B+

Name : Ujjwal Das
Date of Birth : 6/10/2000
Method Paper : Bengali
Qualification : B.A.
Address : Vill- Hularchak, P.S- Hasnabad
District : North 24 PGS
Pin : 743426
Email : dujjwal755@gmail.com
Contact : 9749706122
Blood Gr. : AB+

List of B.Ed. Students for the Session : 2023-25

Name : Tanumoy Das
Date of Birth : 6.11.2000
Method Paper : Physical Science
Qualification : B.Sc.
Address : 31/2 Barada Basak street,
P.S-Baranagar, P.O-Baranagar
District : Kolkata; Pin : 700036
Email : tanumoydas340@gmail.com
Contact : 9330658539; Blood Gr. : O+

Name : Atri Mondal
Date of Birth : 07/06/2000
Method Paper : English
Qualification : B.A.
Address : Uttarpara,Rahara, Khardaha
District : North 24 PGS; Pin : 700118
Email : atrimon2000@gmail.com
Contact : 8777477346,
Blood Gr. : AB+

Name : Uttam Kumar Hansda
Date of Birth : 10/08/1997
Method Paper : Bengali
Qualification : M.A.
Address : Vill-Khejuria, P.O-Gunpura,
P.S - Barikul
District : Bankura; Pin: 722135
Email : uttamhansda48@gmail.com
Contact : 7363908043

"চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি — কর্মের, কমল — ভক্তির, উদীয়মান সূর্যটি — জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি — যোগ এবং জাগ্রত কুন্ডলিনী শক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংস প্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান — যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয় — চিত্রের ইহাই অর্থ।"

— স্বামী বিবেকানন্দ